بسم الله الرحمن الرحيم

# ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান-সন্তুতি লালন পালন করার গুরুত্ব ও ফজিলত

Subject: RAM 101

Submitted To:Ustaz Abdulwahid.

Submitted by:Meherun nesha

Roll:20102114;6th semester.

Address: Shonirakhra,Dhaka

Date: 28/11/2022

اِنَّ الْحَمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُه

:

নিশ্চয়ই, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য,যার সাহায্য ও প্রদত্ত তওফীকে **"ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান-সন্ততি লালন পালন করার গুরুত্ব ও ফজিলত"** নামক এসাইনমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে।দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ও তার পরিবার পরিজন -সাহাবীগনের উপর যাদের মাধ্যমে আমরা পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা পেয়েছি।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ يُؤْمَرُون.

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোরস্বভাব, কঠিনহৃদয় ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহর কোনো হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়। -সূরা তাহরীম (৬৬) :৬

# সূচীপত্র

1. সারসংক্ষেপ – পৃ:৩
2. সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত পৃ:৩–৪
3. পিতা–মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুরুত্ব পৃ:৪–১১
4. সন্তানের লালনপালন – উত্তম শিক্ষাদান পিতা–মাতার উপর ফরয পৃ:১১–১৩
5. সন্তান লালনপালনে শাসন ও তার গুরুত্ব পৃ:১২–১৩
6. সন্তানের শিক্ষা–দীক্ষা পৃ:১৩–১৬
7. সন্তানের শিক্ষায় অতিউৎসাহ পরিহার পৃ:১৬–২০
8. সন্তান সন্ততির উপর মা–বাবার প্রভাবের গুরুত্ব পৃ:২০–২৩
9. কন্যা সন্তান লালনপালনের নববী আদর্শ ও তার ফযিলত পৃ:২৪–২৭
10. সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সময় মায়েদের যে কষ্ট হয় তার ফজিলত পৃ:২৮
11. নেককার সন্তান সন্ততি  পরকালে বাবা–মার মুক্তির উপায় পৃ:২৮–২৯

**সারসংক্ষেপ**

উত্তম লালনপালন - তারবিয়াত পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক যেমন মাতা-পিতার খেদমত, ও সম্মান  সন্তানের কর্তব্য তেমনি মাতা-পিতারও সন্তানের হকসমূহ আদায় করা কর্তব্য। এজন্যই জানা উচিত, তাদের উপর সন্তানের কী কী হক ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে এবং সন্তানের সাথে তাদের আচার-ব্যবহার কেমন হতে হবে। আর তাদের দ্বীনী তারবিয়াত কীভাবে করতে হবে। মূলত তাদেরকে দ্বীনী তারবিয়াত করা, পিতা-মাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। যে মা-বাবা সন্তানের দ্বীনী তারবিয়াতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করবেন তারা দুনিয়া-আখেরাত উভয়জগতে কামিয়াব হবেন। আর যে মা-বাবা সন্তানের দ্বীনী তারবিয়াত করবেন না তারা পরকালে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা নিজে জাহান্নাম থেকে বাঁচো এবং পরিবারকে বাঁচাও। আর এই জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় হল, সন্তানের প্রতি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হকসমূহ পালন করা। আর এই হুকুক সন্তান জন্মলাভের পর থেহেই শুরু হয়ে যায়। সন্তানের তরবিয়ত ইসলামের এক জরুরি বিধান।আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা।

আল্লাহ  তাআলা  ইরশাদ  করেন–
وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ
اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ.
আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিআমতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে? (সূরা নাহল (১৬) : ৭২)

সম্পদের প্রাচুর্যে পূর্ণ একটি পরিবার। তবুও তারা বিষণ্ণ। কারণ তাদের কোল উজ্জ্বল করেনি কোনো ফুটফুটে শিশুর নিষ্পাপ হাসি। আল্লাহ যাকে দান করেন সে-ই কেবল অধিকারী হতে পারে এ নিআমতের।

ইরশাদ  হয়েছে–
لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا، وَ
يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। -সূরা শুরা (৪২) : ৪৯-৫০

**সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত**

সন্তান আল্লাহর দান। আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় এক আমানত। আল্লাহ এর মাধ্যকে পরীক্ষা করেন  বান্দা এই আমানতের যথাযথ হেফাযত করে কি না। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন। এক. সন্তানের কারণে বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কি না। দুই. বান্দা সন্তানকে আমানত মনে করে কি না এবং সে আমানতের হেফাযতে যত্নবান হয় কি না। আল্লাহ তাআলা বলেন

ٌوَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَّ اَنَّ اللهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْم

জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে। সূরা আনফাল (৮) : ২৮

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন– واعلموا، أيها المؤمنون! إنما أموالكم التي خَوَّلَكُمُوها اللهُ، وأولادُكم التي وَهَبَها اللهُ لكم، اختبارٌ وبلاء، أَعْطاكُمُوها لِيَختبرَكم بها ويَبتليَكم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها، والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها.

হে মুমিনগণ! জেনে রেখ, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব। এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় কর এবং দ্বীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য কর।  তাফসীরে তাবারী ১১/১২৬

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ،... وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ،... أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ.

শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ... পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।... জেনে রাখো, প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।  সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮

আরেক হাদীসের ঘোষণা

.ما مِن عبد اسْتَرْعاه اللهُ رعيّةً، فلم يَحُطْها بنصيحة، إلا لم يجدْ رائحة الجنة

আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাকে কারো দায়িত্বশীল বানান আর সে নিজ অধীনস্তদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৫০
মোটকথা, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান-আকীদা, বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক, জীবন যাপন প্রভৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া মাতা-পিতার কর্তব্য।

**পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুরুত্ব**

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত এবং পিতা-মাতার নিকট আমানত। পিতা-মাতার কর্তব্য হল, সন্তানকে আল্লাহর ফরমাবরদার বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা এবং শয়তানের সবধরনের গোলামি থেকে দূরে রাখা। শয়তান চায়, প্রত্যেকটা মানবশিশুকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করতে। জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময়ই তার অঙ্গিকার ছিল আদমসন্তানকে বিপথগামী করা।

তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছিলেন
.وَ شَارِكْهُمْ فِی الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، وَ مَا یَعِدُهُمُ الشَّیْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا

যাও তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও এবং তাদেরকে যত পার প্রতিশ্রম্নতি দাও। বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। সূরা ইসরা (১৭) : ৬৪
অর্থাৎ শয়তান চাইবে সম্পদ ও সন্তানকে বিপথে পরিচালিত করতে। কিন্তু বান্দাকে আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। অভিভাবকের কর্তব্য পালনের মূল পর্বটা এখানে এসেই আবর্তিত হয়।

শিশুরা যেকোনো জিনিস খুব সহজে ধারণ করতে পারে। তাদের স্মৃতিতে তা যেন খোদাই হয়ে যায়। গুণীজনেরা যথার্থই বলেছেন, 'শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকিত নকশা।' সুতরাং সন্তানকে সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলার মূল সময় হচ্ছে শৈশব কাল।
বক্ষমাণ প্রবন্ধে সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে :
এক. সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা

পিতা-মাতার দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। হাদীস শরীফের ইরশাদ-

.ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٌ لا شكّ فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم

তিন ব্যক্তির দুআ কবুল হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। পিতা(-মাতা)র দুআ, মুসাফিরের দুআ ও মজলুমের দুআ। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৩৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯০৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০১৯৬

সন্তান মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে মা-বাবার দুআর বড় ভূমিকা রয়েছে। এজন্য নবীগণ তাদের সন্তানদের জন্য দুআ করতেন।

কুরআন মাজীদে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একাধিক দুআর বিবরণ এসেছে। যেমন

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِیْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِیْ وَ بَنِیَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَام.

এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করেছিল আর তাতে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দিন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৫

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আরো দুআ করেন

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ، رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآء.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু'আ কবুল করে নিন। সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০

মারইয়াম রা. ভূমিষ্ঠ হলে তার ও তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তার মা দুআ করেছিলেন

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ ... وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ، وَ اِنِّیْۤ اُعِیْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْم.

অতঃপর যখন তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন সে বলল,... আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং তাকে ও তার বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম। সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৬

সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে দুআ-রোনাযারি করবে সন্তানের জন্মের আগ থেকেই, সন্তান কামনার সময় থেকেই। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা ফরমান

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّهٗ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً، اِنَّكَ سَمِیْعُ الدُّعَآء.

এ সময় যাকারিয়া স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দু'আ করল। বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দুআ শ্রবণকারী। সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৮

তিনি আরো দুআ করেন হে প্রভু! আপনি আমাকে একটি সন্তান দান করুন। এবং (বলেন)

وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

হে রব! তাকে এমন বানান, যে (আপনার) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে। সূরা মারইয়াম (১৯) : ৬

অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠের পূর্বেই তিনি নেক সন্তান কামনা করে দুআ করেছেন।

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ভূমিষ্ঠের পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দুআ করেছিলেন

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান কর, যে হবে সৎলোকদের একজন। সূরা আসসাফ্‌ফাত (৩৭) : ১০০

হযরত মারইয়াম রা.-এর জন্মের পূর্বে তার মা দুআ করেছিলেন

رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ، اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যে শিশু আছে, তাকে সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ হতে তা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি (সকল কিছু) শোন ও (সকল বিষয়ে) জান।  সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৫

সন্তানের জন্য নেক দুআ করা নেককার মুমিনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর খাছ বান্দাদের একটি গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলে

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। সূরা ফুরকান (২৫) : ৭৪

সুতরাং সন্তানের জন্য বেশি বেশি নেক দুআ করতে থাকা। তাদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। কেননা তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। আল্লাহর কাছে চাইতে থাকলে আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন।

দুই. শিশুর কানে তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী পৌঁছাতে থাকা

জন্মের পর থেকে নবজাতকের কানে এমন সব শব্দবাক্য বলতে থাকা, যা শিশুর হৃদয়ে আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত পয়দা করবে এবং দ্বীন-ধর্মের ভালবাসা সৃষ্টি করবে। এজন্যই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া হয়।

আবু রাফে রা. বলেন

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি ফাতেমা রা.-এর পুত্র হাসান ইবনে আলীর জন্ম হলে তার কানে আযান দিয়েছেন। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১০৫, জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫৯৪

আযানের মধ্যে কী আছে? আযানের প্রথম চারটি বাক্যে আছে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা, পরের দুটি বাক্যে আল্লাহর একত্ববাদ ও শিরকমুক্ত হওয়ার সাক্ষ্য, এর পরের দুটি বাক্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী এবং তাঁর আদর্শকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি, তার পরের দুটি বাক্যে রয়েছে নামায তথা আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত। পরবর্তী দুটি বাক্যে রয়েছে সফলতার প্রতি আহ্বান। সর্বশেষে পুনরায় আল্লাহর একত্ববাদ ও নবীজীর রিসালাতের ঘোষণা।

সুতরাং অভিভাবকের কর্তব্য, শিশুর কানে সুযোগে সুযোগে এমন শব্দ-বাক্য দেওয়া, যা শিশুর হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ জাগ্রত রাখবে, তাঁর প্রতি মহব্বত-ভালবাসা বৃদ্ধি করবে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং আখেরাতের কামিয়াবির জন্য তার মন-মানসিতাকে প্রস্তুত করবে।

সালাফে সালেহীন তথা মহান পূর্বসূরীগণ তাঁদের সন্তানদেরকে ছোট বেলায় দ্বীনের মৌলিক অনেক বিষয় শিখিয়ে দিতেন। তাঁদের একটা নীতি ছিল

كانوا يستحبون أن يُلَقِّنُوا الصبي يُعْرِبُ أولَ ما يتكلم يقول : لا إله إلا الله سبع مرات، ويكون ذلك أول شيء يتكلم به.

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ শিশু স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে সক্ষম হলে তার কানের নিকট সাতবার لا إله إلا الله পড়তেন। ফলে শিশু সর্বপ্রথম যা উচ্চারণ করত তা হল لا إله إلا الله । মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, বর্ণনা ৩৫১৯; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, বর্ণনা ৭৯৬৭

মোটকথা, প্রিয় সন্তান যেন মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য শিশুকাল থেকেই মেহনত করতে হবে। তাকে আল্লাহর গুণাবলির কথা, তাঁর একত্ববাদের কথা, নবীগণের ঘটনাবলি, সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য নেককার বান্দাদের কর্ম ও বাণি শোনাতে হবে।হাদীসে নেক সন্তানকে মা-বাবার জন্য সদকায়ে জারিয়া হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অনেক মা-বাবার দুর্ভাগ্য যে, সামান্য বেখেয়ালীর কারণে তাদের সন্তান গুনাহে জারিয়ার কারণ হয়ে যাচ্ছে। মা-বাপ ছোটকালে শেখায়নি বিধায় বড় হয়ে কর্মব্যস্ততার মাঝে নামাযটাও

শুদ্ধ করে পড়ার সুযোগ হয় না অনেকের। এ সব সন্তান শুধু গুনাহে জারিয়াই নয় বরং কিয়ামতের দিন নিজের দুরবস্থার জন্য আহকামুল হাকেমীনের দরবারে মা-বাবার বিরুদ্ধে আপিল করতেও ছাড়বে না। আল্লাহ তাআলা সকলকে সহীহ বুঝ দান করুন।

তিন. সন্তানকে ভালো ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া

সুন্দর উপদেশ কী ? এখানে আমরা এর দু'টি নমুনা পেশ করছি

ক. হযরত লুকমান হাকীম-এর নাম কে না জানে! তিনি ছিলেন কুশ্রী, নাক চেপটা, ঠোঁট মোটা, হাবাশীদের চেয়েও কালো। ছিলেন কাঠমিস্ত্রি এবং এক ব্যক্তির গোলাম। তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৭০৫-৭০৬

লুকমান রা.-এর যবান থেকে সবসময় প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী উৎসারিত হত। এজন্য তিনি হাকীম তথা প্রজ্ঞাবান অভিধায় ভূষিত হন।

তিনি ছিলেন নেককার বান্দা, আল্লাহর ওলী। তাঁর হেকমতপূর্ণ কথাগুলো আল্লাহর খুব পছন্দ। তিনি নিজ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার নিকট তা এত পছন্দ হয় যে, তিনি কুরআনে কারীমে তা উল্লেখ করে তার বাণীকে চির অমর করেছেন। যুগে যুগে যা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার উত্তম উপদেশের উত্তম নমুনা হয়ে থাকবে। কুরআন মাজীদে সূরা লুকমানের ১৩ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত এর বিবরণ এসেছে। উপদেশগুলো হচ্ছে :

১. সন্তানকে তাওহীদ ও একত্ববাদ তথা আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই এই কথার শিক্ষা দেওয়া। এটি ছিল সন্তানের প্রতি লুকমান হাকীমের প্রথম উপদেশ

"وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ : يٰبُنَیَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, হে বাছা! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। সূরা লুকমান (৩১) : ১৩

২. ইয়াকীন ও বিশ্বাসের উপদেশ। বান্দা যেখানেই থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে দেখেন, তার সম্পর্কে সবকিছু জানেন  সন্তানের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া।

"يٰبُنَیَّ اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِیْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللهُ، اِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

হে বাছা! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোনও পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমণ্ডলীতে বা ভূমিতে, তবুও আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন। সূরা লুকমান (৩১) : ১৬

৩. আল্লাহর আনুগত্যের উপদেশ। নিজে আল্লাহর ফরমাবরদারি করা ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যকেও সে পথে আনার প্রচেষ্টা করা। এ পথে কষ্ট ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে সবর করা।

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ، اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ। সূরা লুকমান (৩১) ১৭

৪. আত্মশুদ্ধি, বিশেষকরে অহংকার থেকে কলবকে পরিষ্কার রাখার প্রতি সন্তানের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا، اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। সূরা লুকমান (৩১) : ১৮

৫. সন্তানকে উত্তম আখলাকে দিক্ষীত করা।

وَ اقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ.

নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর। সূরা লুকমান (৩১) : ১৯

লুকমান হামীক তাঁর সন্তানকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন এর শব্দে শব্দে নিহিত রয়েছে গভীর মর্ম।

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতে রয়েছে আদর্শ শিশু গঠনের উত্তম নির্দেশনা। নবীজী শিশু ইবনে আব্বাসকে যে নসীহত করেছিলেন তা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.-কে ডেকে সওয়ারীতে নিজের পিছনে বসালেন। এরপর তার পিঠে হাত রাখলেন এবং বললেন

يا غلامُ! ألا أعلمك كلماتٍ ينفعُك الله بهن!

প্রিয় বৎস! আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিব, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন?

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু ইবনে আব্বাসকে কিছু গুরত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বড় হওয়ার পর সেগুলো অন্যদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

১. আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা।

احفظ الله يحفظْك، احفظ الله تجده أمامك.

তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে।জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯

অর্থাৎ তুমি আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলো, তাঁর সন্তুষ্টি হাছিলে সচেষ্ট হও, বিপদ-আপদে তিনি তোমার পাশে থাকবেন, তোমাকে সাহায্য করবেন।

২. আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও মহব্বত লাভ করা।

تعرّف إليه في الرّخاء يعرِفْك في الشدة.

সুখের সময় আল্লাহকে চেন, (তাঁর কথা স্মরণে রাখো) দুঃখের সময় তিনি তোমাকে চিনবেন। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৮০৩; আলআহাদীসুল মুখতারা ১০/২৪

অর্থাৎ সুখ ও আনন্দের সয়ম আল্লাহ তাআলার ইবাদত-উপাসনা করে তাঁর মহব্বত ও পরিচয় অর্জন করো, দুঃখ ও মসিবতের সময় তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

৩. আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং একমাত্র তাঁর উপর ভরসা করা।

إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعِن بالله.

যখন চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে। আর যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯

অর্থাৎ কম-বেশি, ছোট-বড় যত কিছু তোমার প্রয়োজন হয়, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার শরণাপন্ন হবে। তাঁর কাছেই চাইবে।

৪. আল্লাহ ছাড়া কারো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই।

واعلم أن الأمة لو اجْتَمَعَت على أن يَنْفَعُوْك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كَتَبَه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يَضُرّوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك

জেনে রেখো, জগতের সকল মানুষ মিলে যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে ততটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। পৃথিবীর সবাই একত্র হয়ে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তবে এর চেয়ে বেশি পারবে না, যা আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। প্রাগুক্ত

৫. তাকদীর ও আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

رُفعت الأقلام وجَفّت الصحُف.

(তাকদীর লেখার) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সহীফা শুকিয়ে গেছে। (এতে আর রদবদল হবে না।) প্রাগুক্ত

অর্থাৎ তোমার জীবনে ভালো ও মন্দ, আনন্দ ও বেদনার যত অবস্থা আসবে সব লেখা হয়ে গেছে এবং সে লেখা চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে। এতে আর কোনো পরিবর্তন হবে না। সুতরাং সুখ ও দুঃখ সব হালতেই তুমি আল্লাহর ফায়সালার উপর রাজি থাকো।

واعلم أن ما أَصابك لم يكُنْ ليُخْطِئَك، وأن ما أخْطأَك لم يكن ليُصِيْبَك.

স্বারণ রেখো, তোমার কাছে (ভালো বা মন্দ) যা এসেছে তা তোমার থেকে দূর হওয়ার ছিল না এবং যা তোমার থেকে ছুটে গেছে তা তোমার নিকট আসার ছিল না। মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমায়দ, হাদীস ৬৩৬; আলআদাব, বায়হাকী, হাদীস ৭৫৮

৬. দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা। বিভিন্ন সময় বান্দা বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। তখন সবর করা।

واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرَج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.

জেনে রেখো, অপ্রীতিকর অবস্থায় ধৈর্যধারণে প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে। নিশ্চয় সবর করলে সাহায্য আসে, কষ্টের পর আরাম আসে এবং সংকটের পর প্রশস্ততা আসে। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৮০৩; আলআহাদীসুল মুখতারা ১০/২৪

লক্ষ করুন, একেকটা নসীহত কত মূল্যবান! একটি শিশুর হৃদয়ে যদি এ উপদেশমালা গেঁথে যায় জীবনের সফলতার জন্য আর কী চাই! প্রতিটি নসীহতই আলোকবর্তিকা। এভাবেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিশু ইবনে আব্বাসের ঈমানী মানস গঠন করেছেন।

নবীজীর নসীহতের পূর্বাপর লক্ষ করলে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সামনে আসবে। তা হল শিশুর সামনে নসীহত পেশ করার আগে সে যেন আগ্রহের সাথে তা কবুল করে সে অবস্থা ও মানসিকতা তৈরি করা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ করে শিশু ইবনে আব্বাসকে নসীহত শোনাতে আরম্ভ করেননি। এর আগে ইবনে আব্বাস রা.-কে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছেন।

তিনি তাকে নিজ সওয়ারীতে উঠিয়েছেন। নিজের সাথে বসিয়েছেন। এতে শিশু ইবনে আব্বাসের মন ভরে উঠেছে। নবীজীর প্রতি একটা টান তৈরি হয়েছে। তারপর তার পিঠে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। এরপর ‘ইয়া গোলাম’  বলে আদুরে সম্বোধন করেছেন। তারপর উপদেশ পেশ করার আগেই সেগুলোর লাভ শুনিয়ে দেওয়া, উপদেশের প্রতি আগ্রহি করে তুলেছেন ‘এগুলো দ্বারা তোমার অনেক উপকার হবে।’ এসবের পর যখন ইবনে আব্বাস রা.-এর মনে পুরোপুরি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তখন একটা একটা করে সবক’টি নসীহত পেশ করেছেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বিশেষ চিন্তার দাবি রাখে তা হল শিশুকে ভালো কাজের অনুপ্রেরণা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সে কাজের লাভের বিবরণ দেওয়া। যাতে নিজ আগ্রহে সে কাজটি করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.-কে শুধু আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সাথে সাথে এর লাভ বলেছেন যে, এতে করে আল্লাহ তোমার সঙ্গে থাকবেন, তোমার সাহায্য করবেন।

তদ্রপ শিশুকে মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে এ কাজের ক্ষতির দিকটাও আলোচনা করা। এতে করে শিশুর মনে মন্দ স্বভাবের প্রতি ঘৃণাবোধ জাগ্রত হবে।

লুকমান হাকীমের হেকমতপূর্ণ উপদেশগুলো আবার একটু লক্ষ করুন যে কয়টি কাজ থেকে তিনি সন্তানকে বিরত রাখতে চেয়েছেন, প্রত্যেকটির সাথে ঐ আচরণের মন্দ দিকেরও বর্ণনা দিয়েছেন।

শিরক সম্পর্কে বলেছেন নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। অহংকারের ব্যাপারে বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনও দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উঁচু কর্কশ আওয়াজের ব্যাপারে বলেছেন নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর হচ্ছে গাধার স্বর।

সুতরাং আমরা শিশুদের প্রতি শুধু ভালো কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেই থেমে যাব না; বরং এর সাথে ভালোর লাভ ও মন্দের ক্ষতির কিছু কিছু দিকও তার সামনে তুলে ধরব। আল্লাহ তাআলাই  উত্তম তাওফীক দানকারী।

**সন্তানের লালনপালন – উত্তম শিক্ষাদান পিতা–মাতার উপর ফরয**

আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা-পিতার উপর সন্তানের উত্তম শিক্ষাদান আবশ্যক করে দিয়েছেন। আর যে বিষয় অবশ্য-পালনীয় তাতে কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার এখতিয়ার থাকে না। হাঁ, নফল বা মুস্তাহাব কাজে সে এখতিয়ার থাকে। ফরয বা ওয়াজিব আদায় না করলে জবাবদিহি করতে হয়।

হযরত সাহবান মাহমুদ রাহ. স্বীয় কিতাব ‘তারবিয়াতে আওলাদ’-এর কারণ উল্লেখ করেন যে, সন্তানের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি তার বাল্যকাল থেকেই শুরু হয়ে যায়।

সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার উপর এই হুকুম বর্তায় যে, তাকে উত্তম তারবিয়াত কর।

এই জন্য পিতা-মাতা যদি সন্তানকে বাল্যকাল থেকেই উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা না দেয় এবং সন্তান এভাবেই তরবিয়াতহীনভাবে বেড়ে ওঠে, পরে শরীয়তের মুকাল্লাফ হওয়ার পর তার থেকে গোনাহ প্রকাশ হতে থাকে তাহলে মাতা-পিতার অবহেলাও যেহেতু তার গোনাহে লিপ্ত হওয়ার একটা উপলক্ষ বা কারণ তাই তার ওই গোনাহগার সন্তানের সাথে সাথে মাতা-পিতাও গোনাহগাররূপে গণ্য হবে।

সন্তানের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখে চুপ না থাকা

উদাহরণ স্বরূপ নাবালেগ সন্তান বালেগ হওয়ার পরও নামায পড়ে না। রোযা রাখে না, যাকাত দেয় না, মেয়েরা পর্দা করে না। সবাই স্বেচ্ছাচারিতার সাথে জীবন-যাপন করে, আর মা-বাবা বসে বসে তা দেখে, কিছুই বলে না। বরং মাঝে মাঝে বলে যে, আমরা তো আমাদের দায়িত্ব পালন করে দিয়েছি। মনে রাখবেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করিনি। বরং আমরা আমাদের দায়িত্বে অনেক অবহেলা করেছি, করছি এবং করেই চলছি। যার ফলে দিন দিন আমাদের গোনাহের কুফল বেড়েই চলেছে।

মনে রাখবেন, মা-বাবা যদি দুনিয়া থেকে চলে যায় আর সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং গোনাহে লিপ্ত থাকে তাহলেও মা-বাবা -যদি দায়িত্বে অবহেলা করে থাকেন- তাদের দায়িত্বে অবহেলা করার কারণে এর কিছু দায়ভার তাদের উপরও বর্তাবে।

আমাদের সকলেরই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। তিনি আমাদেরকে কেবল এই দায়িত্ব দেননি যে, নিজে শরীয়তের পাবন্দ হব এবং আল্লাহর বিধি-বিধান পালন করব। বরং নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এমনকি অধীনস্থদেরসহ সবার জিম্মাদারী আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর দিয়েছেন।

**সন্তান লালনপালনে শাসন ও তার গুরুত্ব**

ছোট বাচ্চাদের শাসনের জন্য মৌখিক রাগ ও তাম্বীহ যথেষ্ট। বেত ও লাঠি দ্বারা মারপিঠ করা ছাড়াও তাদের অন্যভাবে শাসন করা যায়, যেমন পাঠশালায় বা মক্তব মাদরাসায় কোনো বাচ্চা দুষ্টুমী করলে তার শাস্তি হতে পারে দাঁড় করিয়ে রাখা; সকল ছাত্রের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি বিরাট মানসিক শাস্তি। ছাত্রদের যার যত বয়স কম তার লজ্জা, অপমানবোধ ও অভিমান তত বেশি হয়ে থাকে। ফলে সব রকম শাসনের জন্য উস্তাদগণের চোখ রাঙ্গানী, ধমক, তাম্বীহ এবং দাঁড় করিয়ে রাখাই যথেষ্ট।

রাগের সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এজন্য কর্তব্য হল রাগের সময় কোনো ছাত্রকে শাস্তি না দেওয়া, শাসন না করা। শুধু ছাত্রকে কেন, ঘরের বিবি-বাচ্চা, অধিনস্ত লোকজন ও চাকর নওকরকেও শাস্তি না দেওয়া, শাসন না করা। রাগের সময় শাস্তি দিতে

গিয়ে শেষ পর্যন্ত হাজারো ক্ষেত্রে এক বা একাধিক পক্ষের জীবন পর্যন্ত বিনষ্ট হতে দেখা গেছে। এজন্য আরবীতে মাশহুর মাকুলা রয়েছে, 'রাগের শুরু উন্মাদনা ও শেষ অনুশোচনা।'

বিজ্ঞজনেরা বলেন, রাগের সময় যা করবে তাই ভুল হবে। সীমা অতিক্রম করে ফেলার পর অনুশোচনা করে লাভ কি? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা যায় সাধারণত যাদের বয়স যত কম তাদের রাগ তত বেশি হয়ে থাকে। এ জন্য যে উস্তাদগণের বয়স কম, বিশেষ করে ৪০ (চল্লিশ) বছরের কম তাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। যাতে তারা মনে ও শরীরে রাগ আসার শুরুতেই নিজেকে শামলে নিতে পারেন। অর্থাৎ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকতে হবে যে, রাগের বশবর্তী হয়ে কোনো একটা ছাত্রকে বেত্রাঘাত বা মারধর করা যাবে না। রাগ শান্ত হলে ধীরভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে যে অপরাধ কতটুকু, কী পরিমাণ, তার শাস্তি কী হওয়া উচিত, যা কিনা মারধর ও বেত ছাড়াই ব্যবস্থা করতে হবে।

শুধু মক্তব মাদরাসায় কেন বরং ঘরেও ছোট বাচ্চাদের কোনক্রমেই মারধর করা উচিত নয়। এমনভাবে বাচ্চাদের তালিম-তরবিয়ত করতে হবে, যাতে তাদেরকে মারধর করাই না লাগে এবং তারা আদব-আখলাকের সাথে শুরু থেকেই গড়ে উঠতে পারে। অথচ প্রথমে খেয়াল করা হয় না। অবহেলা করা হয়। ঢিল দেওয়া হয়। যার করণে বাচ্চারা বেআদব হয়ে ওঠে। পরে মারধর করা শুরু হয়। যার ফল ক্রমে ক্রমে খারাপের দিকে যেতে থাকে।

আলহামদুলিল্লাহ, ঢাকা ও দেশের অনেক ভাল ভাল মাদরাসায় এ ধরনের নিয়ম চালু রয়েছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেন আমরা ভুলে না যাই। সেটা হল, যে বাচ্চারা দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য মক্তব, মাদরাসায় পড়াশোনা করে তাদের বেশির ভাগ ছাত্র পিতামাতা, ভাই-বোন, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন সকলকে ছেড়ে একটু দূরের মাদরাসার ছাত্রাবাসে থাকতে হয়। ইলমে দ্বীন হাসিল করার এটা একটা বুনিয়াদী উসুল বা নিয়ম যে ঘরে বসে সাধারণত ইলমে দ্বীন হাসিল করা যায় না। অবশ্য ঘরের পরিবেশ যদি দ্বীন ও তরবিয়তের দিক থেকে মাদরাসার মতই হয় তাহলে সুফল আসা স্বাভাবিক। তবে এর দৃষ্টান্ত খুব বেশি নয়। যারা সন্তানদেরকে বাড়িতে রেখে বা বাড়ি-ঘরের কাছে রেখে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিতে চেষ্টা করছেন, তাদের প্রায় সকলেই ব্যর্থ মনোরথ হয়েছেন। যার ফলে বাধ্য হয়ে সন্তানদেরকে কম-বেশি দূরের মাদরাসায় রাখা লাগে। অনেক সময় কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ নয়, বরং একাধারে কয়েক মাস পর্যন্ত সন্তানদেরকে বাড়ি-ঘর থেকে, পিতা-মাতা থেকে দূরে থাকতে হয়। আপনজন ছেড়ে থাকাটাই ছোট বাচ্চাদের জন্য এক কঠিন ব্যাপার, তা ছাড়া বয়স যত অল্প থাকে এ কঠিনতা তত প্রকট হয়ে থাকে। যত ভাল মাদরাসাই হোক না কেন সেখানকার থাকা-খাওয়া কখনো বাড়ির থাকা-খাওয়ার মত হওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে যারা স্কুল-কলেজে জাগতিক বিদ্যাশিক্ষা করে তাদেরকে মাদরাসার ছাত্রদের ন্যায় কচি বয়সে সবকিছু ছেড়ে থাকতে হয় না। তারা পিতা-মাতার কাছেই বেশি সময় থাকে এবং অল্প সময় পাঠশালায় থাকে, ফলে সকলকে ছেড়ে থাকার মনোবেদনা তাদের আদৌ পোহাতে হয় না।

পাঠশালাতে তাদের পাঠের সময়টুকুও মাদরাসার ছাত্রদের সময়ের তুলনায় অনেক কম। তারা অনেক দিক থেকে আরাম-আয়েশ ও আনন্দের মধ্যে থাকে, তদুপরি তাদেরকে বড়

আদর যত্নের সাথে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে যারা ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য অতি কচি বয়সে মাতা-পিতা, প্রিয়জনের আদর-যত্ন সবকিছু ছেড়ে দূর-দূরান্তের মাদরাসায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একাধারে পড়ে থাকে তাদের কচি দেহের উপর বেত্রাঘাত পড়া কীভাবে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? যেখানে বেত্রাঘাত মোটেই না হওয়ার কথা, আদর-যত্ন বেশি হওয়ার কথা, সেখানে ঢালাও বেতের প্রচলন থাকা কি উচিত?

**সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা :**
শিশুরা মানবসমাজের সম্পদ। দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। আজকের শিশু আগামীদিনের পরিচালক। যুগ ও সময়ের পথনির্দেশক। মানব ও মানবতার পথপ্রদর্শক। তাদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা তাই একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার সবচেয়ে উপযোগী সময় শৈশব। গ্রহণ ও ধারণের সর্বোত্তম সময় শৈশব। শিশুরা যেকোনো জিনিস খুব সহজে ধারণ করতে পারে। তাদের স্মৃতি থেকে তা কখনো মুছে যায় না। গবেষকগণ সত্য বলেছেন, 'শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকিত নকশা।'

একটি উদাহরণ দেখুন। উমর ইবনে আবু সালামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপালনে ছিলাম। একবার (বড় পাত্রে) খাবার সময় আমার হাত পাত্রে এদিক-ওদিক ঘুরছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে বাছা! খাবার সময় বিসমিল্লাহ্ পড়বে। ডান হাতে খাবে। নিজের দিক থেকে খাবে। রাবী বলেন, 'এরপর থেকে এটি আমার স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।' -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৩৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৩৮৮

কারণ শিশুদের ধ্যান-ধারণা পাক-পবিত্র। অনুভব-অনুভ‚তি কোমল ও স্বচ্ছ। তারা যখন দুনিয়াতে আসে, তাদের মধ্যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার এবং ন্যায় ও সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করার স্বভাব-যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, প্রতিটি শিশু ফিতরত (সত্য স্বভাব)-এর উপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি বানায় কিংবা খ্রিস্টান বানায় কিংবা অগ্নিপূজক বানায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৫৮

সুতরাং শৈশব থেকেই শিশুর আকীদা-বিশ্বাস ও আখলাক-চরিত্রকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করতে হবে। শিশুরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় পরিবেশ দ্বারা। পরিবেশ তাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। এজন্য তাদেরকে ঘরে ও বাইরে দ্বীনী পরিবেশে রাখতে হবে, যাতে তারা ইসলামী আদর্শে বেড়ে উঠতে পারে এবং এটি তাদের স্বভাবে পরিণত হতে পারে। নতুবা ধীরে ধীরে সে বিজাতির বোধ-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করতে শুরু করবে, বড় হয়ে বিপথগামী হয়ে পড়বে, যা এই নিষ্পাপ শিশুর উপর যেমন অবিচার তেমনি মানবজাতির উপরও।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ, মমতা প্রশ্নাতীত। এ পরম করুণাময় আল্লাহর দান। তিনিই তাদের মনে মমতার এ অফুরন্ত ঝরণা উৎসারিত করেছেন। পিতা-মাতার মমতা-সিক্ত হৃদয় সন্তানের কল্যাণ-কামনায় অস্থির থাকে। কিন্তু কাকে বলে কল্যাণ? মহান আল্লাহ যে পিতা-মাতাকে ঈমান ও হিকমত দান করেছেন, তারা সন্তানের কেবল শারীরিক প্রতিপালনই নয়;

মন-মস্তিষ্ক, বোধ-বিশ্বাস ও আচার-আচরণ নির্মাণেও অস্থির থাকেন। শুধু ইহকালীন সুখ-সমৃদ্ধিই নয়; পরকালীন শান্তি-সাফল্যের জন্যও ব্যাকুল থাকেন। সুতরাং স্বভাবের মমত্ববোধের সাথে যখন আসমানের আলোর সংযোগ ঘটে তখন সন্তানের উভয় জীবন হয় সর্বাঙ্গীণ সুন্দর।

সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা পিতা-মাতার দায়িত্বও। এ স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। -সূরা তাহরীম (৬৬) : ৬

এখানে আগুন শব্দটি প্রণিধানযোগ্য। সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষায় পিতা-মাতার কী পরিমাণ চেষ্টা করতে হয়? তাদেরকে গোনাহ থেকে বাঁচাতে কেমন ব্যাকুল হতে হয়? আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য যেমন ব্যাকুল হন তেমন, আগুন শব্দটি এ ইঙ্গিতই দেয়। ধরা যাক, কোথাও এমন ভায়াবহ আগুন জ্বলছে যে, তাতে কেউ পড়ে গেলে তার জীবিত ফেরা অসম্ভব। কোনো অবুঝ ছেলে যদি সেদিকে পা বাড়ায়, পিতা-মাতা কি শুধু 'যেয়ো না', 'পুড়ে যাবে' বলে বসে থাকবেন? শুধু মৌখিক উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হয়ে যাবেন? আর এ সত্তে¡ও সে যদি দগ্ধ হয়ে যায়, তবে তারা কি একথা বলে দায়মুক্ত হবেন যে, আমরা ওকে নিষেধ করেছি, ও শোনেনি, স্বেচ্ছায় দগ্ধ হয়েছে? পিতা-মাতার তো ছেলেকে আগুনের দিকে যেতে দেখলে ঘুম হারাম হয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোলে তুলে তাকে আগুন থেকে দূরে না নিয়ে যেতে পারবেন ততক্ষণ তারা শান্তি পাবেন না।

সঠিক ও কল্যাণকর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা কেবল পিতা-মাতাই নয়; শিক্ষক, সমাজ, সরকার সবার দায়িত্ব এবং সকলকেই এ বিষয়ে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) জনগণের দায়িত্বশীল। তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মহিলা তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের দায়িত্বশীল। তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল। তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৫৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮২৮

অপর এক হাদীসে এসেছে, তোমাদের সন্তানদের নামাযের হুকুম কর যখন তাদের বয়স সাত বছর। আর যখন দশ তখন (নামায না পড়লে) প্রহার কর এবং তাদের পরস্পরের বিছানা পৃথক করে দাও। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৫

সন্তানের তালীম-তারবিয়াত পুণ্যকর্মও। সন্তান-সন্ততি কেবল পার্থিব অবলম্বনই নয়; পরকালের সম্বলও বটে। পিতা-মাতা তাদের সৎ, যোগ্য ও নেককাররূপে গড়ে তুললে দুনিয়া-আখেরাত সর্বত্র উপকৃত হবেন। মৃত্যুর পরও তারা এর সাওয়াব পেতে থাকবেন। হাদীস

শরীফে ইরশাদ হয়েছে, মানুষের মৃত্যুর পর তিনটি ছাড়া আর সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। সদকা জারিয়া। এমন ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। এবং নেককার সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৩১০

ইসলাম মমত্ববোধ, দায়িত্ববোধ ও পরকাল অবলম্বন- তিনভাবে পিতা-মাতাকে সন্তানের সহীহ তালীম-তারবিয়াতের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করেছে, যাতে কোনো একটি যদি তাদের জাগিয়ে তুলতে না পারে অন্যটি যেন পারে। এবং এই মানবসম্পদ কোনো অবস্থাতেই যেন সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। আর পিতা-মাতার মনে যদি এ তিন চিন্তার সম্মিলন ঘটে তাহলে তো সন্তানের জীবন হবে অতুলনীয়- শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ও ঈমানিক সবদিক থেকে।

মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন। তাতে সন্তানের তালীম-তারবিয়াত বিষয়েও পর্যাপ্ত নির্দেশনা রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে আল্লাহর কিছু বিশিষ্ট বান্দার সন্তান-তারবিয়াতের বিস্ময়কর উদাহরণ। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহপূর্বক এগুলো বর্ণনা করেছেন, যাতে সন্তানের ঈমান ও চরিত্রের ব্যাপারে তাঁদের মনে যে ব্যাকুলতা ও দায়িত্বসচেতনতা ছিল, সবাই তা উপলব্ধি করতে পারে এবং কলিজার টুকরার জন্য নিজেদের মনেও সেটা ধারণ করতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দেখুন:

এক. হযরত লুকমান অত্যন্ত জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদের সূরা লুকমানে সেই উপদেশগুলো বর্ণিত হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) 'এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, ওহে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক কর না। নিশ্চিত জেন, শিরক চরম যুলুম। হে বাছা! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোনো পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমÐলীতে বা ভূমিতে, তবু আল্লাহ তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি সূ²দর্শী, সব কিছুর খবর রাখেন। বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয় এ অত্যন্ত হিম্মতের কাজ। এবং মানুষের সামনে নিজ গাল ফুলিও না এবং ভ‚মিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয় আল্লাহ দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর।' -সূরা লুকমান (৩১) : ১৩, ১৬-১৯

দুই. হযরত নূহ আ. প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত তাঁর কওমকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। আস্তে-জোরে, প্রকাশ্যে-গোপনে, জনতায়-নির্জনতায়- বিভিন্নভাবে তাদের বুঝিয়েছেন। তবু অল্পসংখ্যক ছাড়া কেউ ঈমান আনেনি। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর কঠিন শাস্তি নেমে আসে- মহাপ্লাবন। আল্লাহর হুকুমে ঈমানদার সঙ্গীদের নিয়ে তিনি নৌকায় আরোহণ করলেন। (তরজমা) 'সে নৌকা পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গরাশির মধ্যে তাদের নিয়ে বয়ে চলছিল। নূহ তার ছেলেকে, যে সকলের চেয়ে পৃথক ছিল, বলল, বাছা! তুমি আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর

এবং কাফেরদের সঙ্গে থেক না। সে বলল, আমি এখনই এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। নূহ বলল, আজ আল্লাহর হুকুম থেকে কাউকে রক্ষা করার কেউ নেই, কেবল সেই ছাড়া যার প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। অতঃপর ঢেউ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সেও নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।' -সূরা হুদ (১১) : ৪১-৪২

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) 'নূহ তার প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র তো আমার পরিবারেরই একজন! এবং নিশ্চয় তোমার ওয়াদা সত্য এবং তুমি সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক। আল্লাহ বললেন, হে নূহ! তুমি নিশ্চিত জেনে রেখ, সে তোমার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে তো অপবিত্র কর্মে কলুষিত। সুতরাং তুমি আমার কাছে এমন জিনিস চেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' -সূরা হুদ (১১) : ৪৫-৪৬

ছেলেকে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করার কী ঐকান্তিক চেষ্টা! অথচ তাঁকে ওহীর মাধ্যমে আগেই জানানো হয়েছিল যে, এ পর্যন্ত যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কওমের আর কেউ ঈমান আনবে না। তবু শেষ চেষ্টাটা তিনি করেছেন। কেননা তাঁর নিশ্চিত জানা ছিল, এ আযাবে যে ধ্বংস হবে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। তাকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। কোনো পিতা-মাতার পক্ষে কি সন্তানের এ দুঃসংবাদ সহ্য করা সম্ভব? এ শোনার পর কি তারা হাত-পা জমিয়ে বসে থাকতে পারে?

তিন. ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) 'যখন তার (ইবরাহীম আ.-এর) প্রতিপালক তাকে বললেন, আনুগত্যে নতশীর হও। তখন সে বলল, আমি রাব্বুল আলামীনের সামনে মাথা নত করলাম। ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে একথারই অসিয়ত করল এবং ইয়াকুবও (তার সন্তানদেরকে) যে, হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীন মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমাদের মৃত্যু যেন এ অবস্থায় আসে যে, তোমরা মুসলিম। তোমরা কি সেসময় উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যুক্ষণ এসে গিয়েছিল। যখন সে তার পুত্রদেরকে বলেছিল, আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা সকলে বলেছিল, আমরা সেই এক আল্লাহরই ইবাদত করব, যিনি আপনার মাবুদ এবং আপনার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকেরও মাবুদ। আমরা সকলে কেবল তাঁরই অনুগত।' -সূরা বাকারা (২) : ১৩১-১৩৩

ইয়াকুব আ. নিজেও নবী। তাঁর পিতা হযরত ইসহাক আ.। চাচা হযরত ইসমাইল আ.। দাদা হযরত ইবরাহীম আ.। এটি নবী পরিবার এবং সকলেই বড় বড় নবী। এ থেকেই অনুমান করা যায়, তাঁর ছেলেদের ঈমান কী শক্তিশালী ছিল এবং জীবনাচরণে সেটার কী গভীর প্রভাব পড়েছিল। এ সত্তে¡ও তিনি তাদের থেকে তাঁর মৃত্যুর পর ঈমানে অবিচল থাকার অঙ্গীকার নিয়েছেন। আর এ তিনি কখন করেছেন? মৃত্যুক্ষণে যখন সাধারণ মানুষ হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে কিংবা পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সেসময় তিনি ছেলেদের ভবিষ্যত-ঈমান নিয়ে ব্যস্ত। কারণ তাঁর কাছে ঈমানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যাদেরকে সারা জীবন আগলে রাখা হয়েছে তারা যদি কখনো ঈমান থেকে দূরে সরে যায়? গোনাহ বা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে? তাই মৃত্যুর আগে (নিজের সাধ্য অনুযায়ী) আবারো তাকীদ করছেন।

ইয়াকুব আ.-এর মনকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল কোন প্রেরণাটি; দায়িত্ববোধ না মমত্ববোধ? নিঃসন্দেহে দুটোই। কারণ নবীর মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ আলাদা ধারায় প্রবাহিত হয় না। সুতরাং পিতা-মাতার মনে সন্তানের শারীরিক প্রতিপালনের জন্য যে মমত্ব জাগে, চারিত্রিক ও ঈমানিক প্রতিপালনের জন্যও সেরকম মমত্ব জাগুক। সন্তানকে আগুন থেকে বাঁচাতে তারা যেমন ব্যাকুল হন, অন্যায় ও গোনাহ থেকে বিরত রাখতেও তেমনি ব্যাকুল হোক।

**সন্তানের শিক্ষায় অতিউৎসাহ পরিহার**

মায়ের কোলকে বলা হয়েছে শিশুর প্রথম পাঠশালা। এ সময়ের শিক্ষা তার সারা জীবনের উপর প্রভাব ফেলবে। তাই শিশুকে যতটা সম্ভব ভাল ভাল কথা এবং উত্তম আখলাক শিক্ষা দেওয়া মায়ের কর্তব্য। তার সাথে বেশি বেশি ঈমানী কথা বলা এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ইয়াক্বীন ও মুহাব্বাত পয়দা করা বড় জরুরী। এর মাধ্যমে তার দিলে ঈমানের বীজ বপন হবে। সেই বীজ একমসয় বিশাল বৃক্ষে পরিণত হবে। অতপর তা থেকে ছড়িয়ে পড়বে উত্তম আমল ও সুন্দর আখলাকের শাখা-প্রশাখা এবং তার জীবনব্যাপী থাকবে সেই বৃক্ষের শীতল ছায়া।

কিন্তু দুখের বিষয়, খুব কম মা-ই এ বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ দেন। শিশুর এ মূল্যবান সময়টিকে তারা অহেতুক কাজের মধ্যেই পার করে দেন। যখন তাকে কালিমা শেখানো দরকার তখন শিক্ষা দেওয়া হয় ‘ডগ, ক্যাট, হাট্টি মাটিম টিম’...। আর এসব নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যেন শিশুর প্রতি এগুলোই তাদের কর্তব্য।

ফলে সেই শিশু ঈমানী শিক্ষা আর পায় না। আল্লাহর প্রতি তার আস্থা পয়দা হয় না। এমনকি নবীর পরিচয়ও সে জানতে পারে না। এ সম্পর্কে অতি দুঃখজনক একটা ঘটনা শুনেছি। এক শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হল, বল তো আমাদের নবীর নাম কী? সে জবাব দিল, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ (নাউযুবিল্লাহ) । নবীর পরিচয় তাকে না শেখালেও রবীন্দ্রনাথের ভক্তি ঠিকই তার হৃদয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। আফসোস! মায়েরা আজ কোথায় ঠেলে দিচ্ছে তাদের কলিজার টুকরা সন্তানকে।

যে উম্মতের চিন্তায় ব্যাকুলতায় নবীজী সারা জীবন কেঁদেছেন, আর হাশরের ময়দানে উম্মতী উম্মতী বলে পেরেশান হবেন। সেই উম্মত আজ চিনতে পারছে না তাদের নবীকে। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে। প্রতিটি শিশু তার মা-বাবার জন্য আল্লাহর অনেক বড় নিআমত, তাঁর পক্ষ থেকে আমানত। তাই যে আল্লাহ তাদেরকে এতবড় নিআমত দান করেছেন মা-বাবার উচিত তাঁর পরিচয় শিশুকে শিক্ষা দেয়া এবং আল্লাহর দেয়া এ আমানতকে সঠিক পথে পরিচালিত করা।

কেউ যখন বাবা বা মা হয়ে যায়, তখন যেন তার এক নতুন জন্মও সাধিত হয়। তখন সে মনে মনে এক নতুন ভুবনের বাসিন্দা হয়ে ওঠে এবং দেখতে শুরু করে সেই জীবনের যত রোমাঞ্চকর স্বপ্ন। সবটারই কেন্দ্রস্থলে থাকে তার প্রাণের ধন ওই নবজাতক। আয়-রোজগার করে, তো ওই কুসুমকলিই হয় তার একমাত্র লক্ষবস্তু। আর পরিকিল্পনা করে, তো ওই চাঁদকণাই হয় তার দিগ্নিরূপক। ওই একরত্তি নরপুত্তল বিপুলবিক্রমে তার অন্তর্জগৎ শাসন করতে শুরু করে। সেই শাসনে অনেক পিতামাতাই টাল খেয়ে যায়। এক রকম ঘোরের মধ্যে তারা চলে যায়। কেমন অব্যবস্থচিত্ত ও অপরিণামদর্শী হয়ে ওঠে।

বলছি সেই স্বপ্নবিভোর মা-বাবার কথা। নিজ সন্তানকে নিয়ে যাদের উৎসাহ বড় বেশামাল। যত রকমের ভালো ভালো স্বপ্ন আছে, তার সবটাই তারা নিজ আদরের দুলাল-দুলালীর প্রতি স্থাপিত করে। গুণে, যোগ্যতায়, অর্থবিত্তে, প্রতিভায়-প্রতিষ্ঠায় সবকিছুতে তাদের জীবন ভরে উঠবে, তারা সকলের উপরে চলে যাবে, সকলের জন্য ঈর্ষণীয় হয়ে ওঠবে- এরকম কল্পনাই তারা করে। তাই বিপুল উৎসাহে তারা সন্তানকে গড়ে তোলার সংগ্রামে নেমে পড়ে। তাদের দেরি সয় না। রঙীন ভবিষ্যত রচনার আশায় বর্তমানকে নিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। পরিণাম কী দাঁড়াবে তা চিন্তাই করতে পারে না। ফলে তাদের সেই অতি-উৎসাহের উচ্ছ্বাসে সন্তানের বর্তমান বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, আর যেই ভবিষ্যতের জন্য এত আকুলি-বিকুলি তা চির অধরাই থেকে যায়।

উচ্চাভিলাষকাতর পিতামাতার কামনা, তাদের সন্তান অতি অল্পসময়ে অনেক বড় হয়ে উঠুক। সন্তানের ক্ষমতা কতটুকু সেদিকে তাদের লক্ষ থাকে না। বয়স হয়েছে কি না সে চিন্তাও করে না। তাই বোল ফুটতে না ফুটতেই তারা শিশুকে বিদ্যাচর্চায় নিয়োজিত করে। যে বয়সটা কেবলই বায়না-আবদার ও খেলাধুলার, সে বয়সের শিশুকেই আজ দেখি বইখাতার ভারে ন্যুব্জ।

হয়ত বা কিন্ডার গার্টেনের শিশুশিক্ষা দেখেই দ্বীনী মাদরাসায় পড়াতে ইচ্ছুক অভিভাবকদের অনেকেও আজকাল এই বল্গাহীন উৎসাহের শিকার হয়ে পড়েছে। শিশুর বয়স তিন-চার হতে না হতেই তারা মক্তব-মাদরাসায় ভর্তি করানোর জন্য নিয়ে আসে। যতই বোঝানো হোক না কেন, তাদের এক কথা- ছেলেকে বা মেয়েকে আলেম-হাফেয বানাতে হবে এবং তার শুরুটা করতে হবে এখনই। যথারীতি পড়াশুনা করার বয়স ও বুঝ হয়েছে কি না তা ভাবতেই নারাজ। উচ্ছ¡সিত উদ্দীপনার তোড়ে সেই বোধ-ভাবনা ভেসে গেছে। অগত্যা মক্তব-মাদরাসার পরিচালক-মুহতামিম তাকে ভর্তি করে নেন এবং ওই শিশু তার শৈশবের ভোগ-উপভোগ বিসর্জন দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক বিদ্যাভ্যাস শুরু করে দেয়। এই শ্রেণীর অভিভাবকদের আগ্রহেই বোধ করি কোথাও কোথাও এরকম প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেখানে অবোধ শিশুরা রীতিমত ছাত্র হয়ে লেখাপড়া করছে।

আগ্রহের এই বাড়াবাড়ি শিশুর দৈহিক ও মানসিক গঠনের পক্ষে কত ক্ষতিকর তা বলাই বাহুল্য। সেই সংগে যে লক্ষে এত অল্প বয়সে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় নিয়োজিত করা

হচ্ছে তাও কি কাক্সিক্ষতরূপে অর্জিত হয়? বহুলাংশেই হয় না। অধিকন্তু অনেক শিশু গোড়াতেই বা মাঝপথেই ঝড়ে যায়।

ঝড়ে যাওয়ার কারণ যেমন শিশুর দৈহিক অপুষ্টি ও মানসিক অপ্রস্তুতি, যা কি না তার মাতৃকোল থেকে দূরে থাকার পরিণাম। তেমনি এর এক কারণ বয়সের অনুপযুক্ততাও। খেলার বয়সে পাঠচর্চার বাধ্যবাধকতা তার পক্ষে সুখকর হওয়ার কথা নয়। অস্বাদু বস্তু কতকাল চর্বণ করা যায়! তার মন টানে মায়ের কোল, ডাকে বাড়ির আঙিনা, খোঁজে খেলার সাথীরা। এই নিরানন্দ চর্চার অঙ্গন সে কতক্ষণ মেনে নেবে! তাই পড়ায় মন বসে না। অপেক্ষায় থাকে কখন ছুটি হবে আর পরমানন্দের শৈশব উপভোগে ছুটে যাবে। মা-বাবার আশা ছিল অল্প বয়সে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। কিন্তু অনেক দূর তো দূরস্ত, খুব কাছের ধাপটিও এগোয় না। নিরুদ্যম চলা তো এগোনোর কথা নয়। কিন্তু তারা সে কথা বুঝতে চায় না। তাই চাপ বাড়ে। চাপ দেয় শিশুর উপর, তাড়া দেয় শিক্ষককেও। শিক্ষক ও অভিভাবকের যৌথ চাপে বেচারা নাজেহাল। তাই দমবন্ধ পরিবেশে সে আর থাকতেই চায় না। শুরু হয় পালানোর পালা। অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায় একটা সম্ভাবনা। কে এর জন্য দায়ী? দায়ী ওই অতি উৎসাহ ও আকাক্সক্ষার বাড়াবাড়ি।

সন্তান অনেক বড় কিছু হোক এ আশা যে কোনও পিতামাতারই থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এর জন্য তাড়াহুড়ার অবকাশ নেই। ধৈর্য ধরতে হবে। থাকতে হবে হজমশক্তি। অর্থাৎ আশা-আকাক্সক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সঠিক বয়সের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, শিশুর নিয়মিত শিক্ষা কত বছর বয়স থেকে শুরু করা যায়? আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, সাত বছর বয়স থেকে। তাঁরা এটা বলেন একটি হাদীসের ভিত্তিতে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

তোমরা তোমাদের সন্তানরদেরকে সাত বছর বয়সে নামাযের হুকুম দাও, আর দশ বছর বয়স হলে নামাযের জন্য (প্রয়োজনে) মার এবং তখন তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৫

শিশুর উপর নামায ফরয নয়। তা ফরয হয় বালেগ হলে। তাহলে সাত বছর বয়সে কেন নামাযের হুকুম দিতে বলা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে এর উদ্দেশ্য নামাযের শিক্ষা দান করা। এই বয়সে বড়দের সাথে নামায পড়লে সে দেখে দেখে শিখতে পারবে নামায কীভাবে পড়তে হয়। পূর্ণাঙ্গ নামাযের জন্য শেখার আছে অনেক কিছুই। সাত বছর বয়সে শুরু করলে দশ বছর হতে হতে তা শেখা হয়ে যায়। এর ভেতর দিয়ে তার প্রয়োজনীয় ভাষাজ্ঞান, কুরআন পাঠ এবং দুআ কালাম ও কিছু মাসাইলও আয়ত্তে এসে যায়। মোটামুটি মেধা থাকলে ও মেহনত করলে কুরআন মাজীদের হিফজও হয়ে যায়। কাজেই যথারীতি শিক্ষাদানের জন্য সাত বছর বয়সই উপযুক্ত সময়। এরপর দেরি করা যেমন ঠিক নয়। তেমনি এর আগে তাড়াহুড়া করাও উচিত নয়। হাঁ, এর আগে যা হতে পারে তা হচ্ছে খেলাধুলার ভেতর দিয়ে

অনিয়মিত শিক্ষা। সে দায়িত্ব মা-বাবার হাতে থাকাই শ্রেয়। দাদা-দাদী থাকলে তারাও মা-বাবাতুল্য। তারা খেলাচ্ছলে শিশুকে অক্ষরজ্ঞানের সাথে পরিচিত করতে পারেন এবং দিতে পারেন দ্বীনের একদম বুনিয়াদী শিক্ষা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, ধর্ম, নবী, কিতাব প্রভৃতির নাম, ইসলামী আদব-কায়দা যথা সালাম দেওয়া, ডান হাতে খাওয়া, বিভিন্ন কাজকর্মের ছোট ছোট দুআ এবং শিশু বয়সের উপযোগী নৈতিক জরুরি শিক্ষা। মোটকথা সাত বছর বয়সের আগে কোনও রকম ভারী তালিম কিছুতেই নয়। সেজন্য সাত বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

উপরিউক্ত হাদীসে নামাযের জন্য মার ও বিছানা আলাদা করার জন্য দশ বছর বয়সের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা আমরা বুঝে নিতে পারি, দশ বছর বয়সের আগে শিশুর উপর কোনো দৈহিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি সমীচীন নয়। এর দাবি হচ্ছে, সাত বছর বয়সে তার যে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা শুরু হবে, তা অনাবাসিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ কেবল পড়াশুনার সময়টুকুই প্রতিষ্ঠানে থাকবে। খাওয়া-দাওয়া, গোসল, ঘুম ইত্যাদি হবে মায়ের পরিচর্যায়। পড়াশুনার বাইরে সময়টা কাটাবে পরিবারের সদস্যদের সাথে। তার শারীরিক পুষ্টি ও মানসিক গঠনের জন্য এটা খুবই জরুরি। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণভাবে আমাদের দেশের আবাসিক প্রতিষ্ঠানের থাকা-খাওয়া ও পরিবেশ-পরিমণ্ডলের যা অবস্থা, এককথায় তাকে স্বাস্থ্যকর বলা চলে না। দশ বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে সেই পরিবেশে সমর্পণ করা যায় না। করা উচিত নয়। সেজন্য অন্ততপক্ষে তার দশ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করা চাই।

একথা ঠিক যে, আধুনিক শিক্ষার মত দ্বীনী শিক্ষার অনাবাসিক ব্যবস্থা আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। তাই অপারগ হয়েই দূরের আবাসিক প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশুদের সমর্পণ করতে হয়। কিন্তু আমরা মনে করি হিম্মতের সাথে চেষ্টা করলে ধারে কাছে অনাবাসিক ব্যবস্থা করে নেওয়া সম্ভব। আমরা এমন অনেক ত্যাগী পরিবারকে দেখেছি, যারা তাদের শিশুদেরকে অনাবাসিকভাবে দ্বীনী শিক্ষাদানের জন্য নিজ নিজ বাড়ি ভাড়া দিয়ে কোনো দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের কাছে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকছে। এছাড়াও বিভিন্ন উপায় রয়েছে, বিজ্ঞজনদের সাথে পরামর্শ করে তার যে কোনও একটা অবলম্বন করা যেতে পারে। আসল কথা হচ্ছে প্রয়োজন উপলব্ধি করা। যদি আমরা বুঝতে পারি, দৈহিক ও মানসিক অপুষ্টির স্থায়ী ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য শিশুকে অন্তত দশ বছর বয়স পর্যন্ত পারিবারিক পরিমণ্ডলে রাখা জরুরি, তবে আল্লাহ চাহেন তো ব্যবস্থা একটা না একটা হয়েই যাবে। এর জন্য পরিবারের দ্বীনী ও তালিমী পরিবেশের নির্মাণ-সংস্কার প্রয়োজন হলে তা অবশ্যই করে নিতে হবে। সেই পরিবেশ না থাকাকে কিছুতেই অজুহাত বানানোর সুযোগ নেই।

অনেককে বলতে শোনা যায়, ঘরে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন নেই এবং দ্বীনী শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। এখানে থাকলে শিশু নষ্ট হয়ে যাবে। তারা চিন্তা করে না, সেই নষ্ট হওয়াটাই তো সে যখন ছুটিতে বাড়ি আসবে তখনও হবে। তা থেকে শিশুকে রক্ষা করতে হলে ঘরের পরিবেশকে সুষ্ঠুরূপে গড়ে তুলতেই হবে, যদিও শিশু আবাসিক প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। সেই দিকে নজর না দিয়ে শিশুকে আবাসিক প্রতিষ্ঠানে পড়তে দিলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। বরং তাতে ক্ষতির মাত্রা আরও বাড়বে। একদিকে আবাসিক প্রতিষ্ঠানে থাকার কারণে তার কচি

মন ও কাঁচা দেহ পারিবারিক স্নেহরস থেকে বঞ্চিত হল। শরীর ছাপিয়ে যার ক্ষতিকরতা মন-মানসিকতাকেও আক্রান্ত করবে। ফলে সুকুমারবৃত্তির স্থলে তার ভেতর রূঢ় নির্মম প্রবৃত্তি দানা বাঁধবে। মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, পরিণত বয়সের বিভিন্ন অশুভতার জন্য শৈশবের পারিবারিক বঞ্চনাই দায়ী।

অন্যদিকে ছুটি-ছাটায় যখন বাড়ি আসবে আর সকলকে বিপরীত পরিবেশে পরিতুষ্ট দেখবে, তখন সে কেবল হোঁচটই খাবে না দমেও যাবে এবং ক্রমে তার ভেতর জন্ম নেবে হীনম্মন্যতাবোধ। একবার তা জন্ম নিয়ে ফেললে তাকে গড়ে তোলার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বস্তুত হীনম্মন্যতাবোধের কুফল বহুমাত্রিক ও অতি দূরপ্রসারী।

আর কিছুই না হোক ঘরের পরিবেশ দ্বীনসম্মত না হলে ঘরের বাসিন্দারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ঘরে আগুন জ্বলছে বলে শিশুকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিলাম আর নিজেরা সেই আগুনে নিশ্চিন্তে জ্বলতে থাকলাম এটা কেমন বুদ্ধির কথা!

যা হোক বলছিলাম, উৎসাহকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বয়স দশ না হওয়া পর্যন্ত শিশুকে কিছুতেই আবাসিক প্রতিষ্ঠানে দেওয়া সমীচীন নয়। তা দেওয়া যাবে কেবল দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পরই। সেক্ষেত্রে অনেক কিছু করার আছে। সবগুলো নিয়ে আলোচনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। উৎসাহের বাড়াবাড়িটাই এস্থলে আমাদের নির্দেশ্য।

কোনও কোনও অভিভাবক এবং কোনও কোনও শিক্ষকও শিশুর উপর বাড়তি ভার আরোপ করে থাকেন। তাদের লক্ষ অতি অল্প সময়ে অনেক বেশি শিখিয়ে ফেলা। শিশু কতটা ভার বইতে পারছে এবং কতটুকু তার সক্ষমতা সেদিকে তাদের নজর থাকে না। দৃষ্টি কেবলই নিজ অভিলাষ ও নিজের স্বপ্নের দিকে। অনেক শিশুর শিক্ষাজীবনের পাট এ কারণেও চুকে যায়। শিক্ষা তার কাছে এক সাক্ষাৎ নির্যাতন। কিছুকাল সে তা সয়ে যায়, কিন্তু কাহাঁতক। এক সময় সে এ জীবনের হাল ছেড়ে দেয়। তাকে হতাশায় পেয়ে বসে। ভাবে, তাকে দিয়ে কিছু হবে না। তার কোনও ক্ষমতাই নেই।

ক্ষমতা না থাকবে কেন? হয়ত অন্য আরেকজনের মত নেই। যেটুকু আছে তার তো সদ্ব্যবহার করা যেত এবং রয়ে সয়ে কাজে লাগালে তার ধার বাড়তেও পারত। সেই সুযোগ তাকে দেওয়া হয়নি। তুলনামূলক যে বেশি মেধাবী তার সাথে তাকে সমানতালে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ভুলটা এখানেই। তার গতিবেগ বুঝে সেই অনুযায়ী চালাতে থাকলে তার মধ্যে সাহস সঞ্চার হত এবং নিজ সক্ষমতার উপর আস্থা তৈরি হত। অগ্রগামিতার জন্য আত্মবিশ্বাস অতি জরুরি। এর দ্বারা প্রখর মেধাবীকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। 'আমি পারব' এই বোধ অনেক মূল্যবান।

একবার জনৈক শিক্ষক তার এক ছাত্র সম্পর্কে অভিযোগ করছিল, তিন দিন হয়ে গেল সে এক পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে পারছে না। আমি বললাম, এক পৃষ্ঠা সবক না দিয়ে যদি আধা পৃষ্ঠা দিতেন পারত কি না? তিনি বললেন, তা হয়ত পারত। বললাম, পাঁচ লাইন দিলে? বলল, তা

অবশ্যই পারত। আমি বললাম, সেটাই উচিত ছিল। তাতে এই তিন দিনে তার এক পৃষ্ঠা মুখস্থ হয়ে যেত। এক পৃষ্ঠা দেওয়ার ফলে তার তিনটা দিন নষ্ট হয়ে গেল। সেই সংগে জন্ম নিল ‘না পারার’ বোধ। এখন এই বোধ তাকে কুড়ে কুড়ে খাবে। তা থেকে বাঁচাতে চাইলে সবক কমিয়ে দিন। রোজ যতটুকু পারে সেই মাত্রায়। অবশেষে সে ছাত্র একজন ভালো হাফেজ হয়েছে।

এটা একটা উদাহরণ। শিশুশিক্ষার যে কোনও বিভাগ ও যে কোনও স্তরেই এটা প্রযোজ্য। শিশুকে যে শিক্ষাতেই নিয়োজিত করা হোক না কেন, অভিভাবক ও শিক্ষককে তার সক্ষমতা বিবেচনায় রাখতেই হবে। বাড়তি চাপ কেবল তার অগ্রগতিকেই ব্যাহত করবে। কোনও সুফল বয়ে আনবে না। বাড়তি চাপের উদ্দেশ্য তো থাকে বেশি শেখানো ও তাড়াতাড়িতে গন্তব্যে পৌঁছানো। কিন্তু ফল হয় উল্টো। ক্ষমতার বেশি চাপ দিলে শিশুর পাঠ কখনই লক্ষমাত্রায় পৌঁছায় না এবং সময়ও অনেক বেশি লেগে যায়। যেমনটা আমরা উদাহরণটিতে দেখলাম।

উৎসাহের বাড়াবাড়ি হয় বিষয় নির্বাচনেও। হিফজের ক্ষেত্রেই এটা বেশি লক্ষ করা যায়। কুরআন মাজীদের হিফজ যে অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর ফযীলতও বিশাল। তাই অনেকেই তাদের সন্তানকে হাফেজ বানানোর আশা করে। এ আশা প্রশংসনীয়। আমরা একে মুবারকবাদ জানাই। কিন্তু এ আশা বাড়াবাড়িতে পরিণত হয়, যখন দেখা যায় ছেলে বা মেয়ে এগোতো পারছে না, ওদিকে বয়সও হয়ে যাচ্ছে। তা সত্তে¡ও অভিভাবকের জিদ তাকে হাফেজ হতেই হবে। এ জিদ অসংগত। এর ফলে সেইসব ছেলেমেয়ের জীবনে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। সবচে বড় ক্ষতি তো এটাই যে, কোনওমতে তারা হাফেজ হয়ে গেলেও ইতোমধ্যে তাদের বয়স অনেকখানি গড়িয়ে যায়। এরপর আর তাদের অন্য কিছু শেখার সুযোগ থাকে না। হাফেজ হয়েছে অনেক ভালো কথা, কিন্তু ইসলামী জিন্দেগীর জরুরি তালিম গ্রহণ তো ফরয। এমন বহু হাফেজ ছেলেমেয়ে আছে যারা সেই ফরয পরিমাণ ইলম না শিখেই শিক্ষা জীবন সাংগ করে। অতপর আয়-রোজগার ও ঘর-সংসারের কাজে লেগে যায় এবং তাতে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে যে, সারাটা জীবন জাহালাতের অন্ধকারের মধ্যেই থেকে যায়।

সুতরাং জিদ না ধরে বাস্তবতাকে মেনে নেয়াই শ্রেয়। যখন দেখা যাচ্ছে ছেলেমেয়ের বয়স হয়ে যাচ্ছে, ওদিকে হিফজও আশানুরূপ এগোচ্ছে না, তখন হিফজ মওকুফ করে জরুরি তালিমেই নিয়োজিত করা কর্তব্য। অর্থাৎ এক রোখা উৎসাহ দ্বারা তাড়িত না হয়ে ‘আলআহাম ফাল আহাম’ তথা গুরুত্বের পর্যায়ক্রমকে বিবেচনায় রাখা চাই।

সারকথা, সন্তানের শিক্ষাদানে তাড়াহুড়ার অবকাশ নেই। ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হতে হবে। যে কোনও নির্মাণকার্যেই ধীরস্থিরতা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাদান ও ব্যক্তিগঠনের ব্যাপারটাও তার ব্যতিক্রম নয়; বরং এক্ষেত্রে তা আরও বেশি জরুরি। এটা মানব প্রকৃতিরও দাবি। মানুষের জন্ম ও বর্ধনপ্রক্রিয়ার ধীরতা থেকে আমরা সে শিক্ষাই পাই। বিভিন্ন হাদীসেও এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কাজেই অতি উৎসাহকে প্রশ্রয় না দিয়ে অভিজ্ঞজনদের পরামর্শমত ধীরস্থিরভাবে সামনে চলতে হবে। সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যত রচনা কেবল এ পথেই সম্ভব।

উল্লেখ্য, ধীরস্থিরতার মানে সময় নষ্ট করা নয়; বরং উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকা এবং সময়ের ধারণক্ষমতাকে বিবেচনায় রাখা। সেইসংগে শিক্ষার্থীর সক্ষমতার বিষয়টাও। উপযুক্ত সময়ে তার পক্ষে যে পরিমাণ পড়াশুনা সম্ভব তাতে যাতে তার দ্বারা কোনও গাফলতি না ঘটে সে ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। এর বাইরের উৎসাহ নিয়েই আমাদের কথা। তা পরিত্যাজ্য। মনে রাখতে হবে হাদীসের বাণী-

الأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ হতে আর তাড়াহুড়া শয়তানের কাজ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২০১২

**সন্তান সন্ততির উপর মা-বাবার প্রভাবের গুরুত্ব**

মা-বাবার সকল কাজের প্রভাব পড়ে সন্তানের উপর। তাই ভালো-মন্দ কাজের আগে মা-বাবাকে ভাবতে হবে। নিজে ভালো-মন্দ যেমনই হই সন্তান যেন সৎ ও নিষ্ঠাবান  হয় তা সকলেই চায়। কিন্তু চাইলেই তো হবে না, সেরূপে কাজও করতে হবে।

সন্তান যদি বাবাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করতে দেখে তাহলে সন্তানও  মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করবে। জামাত ছুটলেও অন্তত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছুটবে না। কিন্তু বাবা যদি মাঝে মাঝে নামাযের জন্য মসজিদে যান তাহলে সন্তানের নিয়মিত মসজিদে যাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কারণ নিয়মিত মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সে নিজ থেকেই উপলব্ধি অর্জন করেনি। তেমনিভাবে সন্তান যদি মাকে জায়নামাযে দেখে, তাহলে অবুঝ বয়সেও সে মায়ের সাথে নামায পড়বে, সিজদা দিবে। মূলত সন্তান শিশুকাল থেকে মা-বাবাকে যেমন দেখবে নিজের জীবনকে তেমনই সাজাবে। সন্তানের স্বার্থে হলেও আমাকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত জীবন কাটাতে হবে।

মা-বাবা ভাল-মন্দ বিবেচনা করেই কিছু একটা করলেন কিন্তু সন্তানের তো বিবেচনা শক্তি কম, ফলে প্রথম দেখায় তার কাছে যেমন মনে হবে সে তেমনভাবেই গ্রহণ করবে। বাছ-বিচার করার মেজাজ এখনও তার হয় নি। তাই সাবধান! অতি সাবধান!!

মা-বাবা ঘরে টিভি রেখেছেন দেশ বিদেশের খবরাখবর জানার জন্য। কিন্তু সন্তান মা-বাবাকে টিভির সামনে বসতে দেখে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বসবে, ভালো-মন্দ সবকিছু দেখবে। অতপর নষ্ট জীবনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে।

সন্তান যদি মা-বাবাকে কখনো টিভির সামনে না দেখে তাহলে সে কখনো হয়তো লুকিয়ে-ছাপিয়ে দেখবে, কিন্তু ‘অন্যায়’ জেনেই দেখবে।

এক সন্তান বাবার পকেট থেকে চুরি করে সিগারেট নিয়ে ধুমপান করত। একদিন বাবার কাছে ধরা পড়ে যথারীতি উত্তম-মাধ্যমের শিকার। কিন্তু উত্তম-মাধ্যম চলাকালীনই সন্তান বলে ফেলল, 'তুমি সিগারেট খাও তাতে কোনো দোষ নেই, আমরা খেলেই দোষ।' শিক্ষিত বাবার তৎক্ষণাৎ হুঁশ এসেছে। সেই থেকে ধুমপান ছেড়েছেন, আজও সে অধুমপায়ী।

'মা'কে সন্তানের কল্যাণে আরো বেশি মনযোগী হতে হবে। গর্ভকালীন মায়ের সকল কর্মের প্রভাব পড়ে সন্তানের উপর। খাদ্যের দ্বারা গঠন হয় শরীর। মানসিক প্রস্তুতির দ্বারা হয় আত্মিক ভিত্তি। মা যদি সর্বদা ওযুর সাথে থাকেন সন্তানের কল্যাণের আশায়, সুযোগ পেলেই কুরআন তিলাওয়াত করেন, নামাযে দাঁড়িয়ে যান সন্তানের সুন্দর জীবনের কামনায়, তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তাকে মাহরূম করবেন না। সন্তানের জীবনে হয়তো তার সে প্রত্যাশা সত্য হয়ে উঠবে।

শুরু থেকেই ভাবতে হবে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে। অনেকেই ভাবেন, বড় হলে ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দিব। একসময় ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মনে রাখবেন, যত ভালো প্রতিষ্ঠানই হোক কিছু না কিছু অনাকাংখিত মানুষ  সেখানেও থাকে। এরা প্রতিষ্ঠানের ফসল নয়; মা-বাবার ফসল।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, হাফেজা মায়ের সন্তান অতিমাত্রায় মেধাবী হয়। কারণ, সন্তান গর্ভে নিয়ে মা নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করেন। ফলে কুরআনের বরকতে সন্তানের মেধার উন্নতি ঘটে ও আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনায় কুরআনের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে- 'গর্ভকালীন বয়স ৪-৫ মাস হলেই মায়ের কার্যক্রম সন্তানের উপর প্রভাব ফেলে'। তাই ডাক্তাররা বলেন, সন্তান গর্ভে নিয়ে কখনো দুশ্চিন্তা করবেন না, পারতপক্ষে ভয়ংকর পরিবেশের সম্মুখিন হবেন না, সব সময় খোশ মেজাজে থাকার চেষ্টা করবেন ইত্যাদি। একজন সৎ জীবন যাপনকারী মা'র দ্বারা একটি সৎ সন্তানই নয় একটি সৎ জাতিরও জন্ম হয়। তাই সকল 'মা'দেরকে আরো বেশি সতর্ক ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

এক মা'কে বলা হল, আপনার ছেলে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসছে। মা বললেন, অসম্ভব! আমার সন্তান যুদ্ধ থেকে পালাতে পারে না। হয় বিজয় লাভ করে গাজী হয়ে ফিরবে না হয় শহীদ হবে। সময় গড়ালে দেখা গেল গাজী হয়ে ফিরছে। মা'কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এ আত্মবিশ্বাসের উৎস কী? উত্তরে বললেন, আমি সন্তানকে যখনই দুধ পান করিয়েছি, প্রথমে ওযু করেছি, এরপর দুই রাকাত নামায পড়েছি এরপর দুধ দিয়েছি। অতএব আমার এই ওযু অবস্থায় নামাযের পর পান করানো দুধের সন্তান কখনো কাপুরুষ হতে পারে না।সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বার্থে মা-বাবার সতর্ক, সৎ ও নিয়ন্ত্রিত জীবনের গুরুত্ব অনেক।

একটি শিশু জন্মের পর  থেকেই সাধারণত মায়ের কাছে থাকে। মা-ই তার প্রথম পাঠশালা। তাই সন্তান আদর্শ ও সৎ হওয়ার পিছনে মায়ের ভূমিকাই বেশি। একটি সন্তান পৃথিবীতে কত বড় হবে, কত ভালো হবে, তার অনেকটাই নির্ভর করে মায়ের উপর। সেজন্য সর্বাগ্রে মা-কে

সচেতন হতে হবে। সন্তানকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং তা যথার্থভাবে বাস্তবায়নের প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সন্তান মা-বাবার হাতে আল্লাহর আমানত, তাঁর দেয়া নেয়ামত। এদেরকে সুশিক্ষা দেয়া হল কি না সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। কোনো কোনো মা-তো নিজের অজান্তেই সন্তানের মন্দ স্বভাবের কারণ বনে যান। অন্যের খেত থেকে মরিচ, মূলা, আলু ইত্যাদি আনার জন্যে শিশুকে বলেন। এতে করে সন্তান ধীরে ধীরে চুরির পথে পা বাড়ায়। তাই একজন দায়িত্ববান ও সচেতন মা হিসাবে প্রতিটি পদক্ষেপে সজাগ থাকা অত্যন্ত জরুরি। মনে রাখতে হবে সন্তানের প্রথম বয়সই তার সংশোধনের উপযুক্ত সময়। একটি শিশু জন্মের পরই মা-বাবার উপর শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কিছু দায়িত্ব এসে পড়ে। যেমন শিশুর ডান কানে আযান বাম কানে ইকামত দেয়া। ভাল নাম রাখা। যথাসম্ভব সাত দিনের দিনে আকীকা দেয়া ইত্যাদি। এগুলো হল সন্তান জন্মের পর প্রাথমিক কিছু বিষয়। এরপর আসে সন্তানের সুষ্ঠু লালন-পালন ও আদব শিক্ষা দেয়ার পর্ব। আর সন্তানকে আদব কায়দা শিক্ষা দানের গুরুত্বপূর্ণ সময় হল তারা যখন কথা বলতে শিখে। ঐ সময় তাকে যেটা শিক্ষা দেওয়া হয় সেটাই সে শিখে নিবে।

তাবেয়ী ইবরাহীম আততাইমী রাহ. বলেন, তাঁরা (সাহাবীগণ) শিশু কথা বলা শিখলে তাকে কালিমার তালকীন করতেন (মুখে মুখে বলা শিখাতেন)। যাতে শিশুর প্রথম কথা হয় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৩৫১৯) দ্বিতীয়ত সাত বছর হলে শিশুকে নামাযের আদেশ দেয়া। দশ বছর হলে নামায না পড়লে প্রয়োজনে প্রহার করা, যা হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। এরপর তাকে কুরআন শিক্ষা দেয়া। সাত বছর বয়সেই কুরআন শিক্ষা দেওয়া উচিত। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নামাযের জন্য যখন সাত বছর বয়সকে নির্ধারণ করা হয়েছে, এর থেকে আমার মনে হয় এই বয়সটাই নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া শুরু করার উপযুক্ত সময়।

আর কুরআন শিক্ষাকারী ব্যক্তিকে আল্লাহর রাসূল সর্বোত্তম ব্যক্তি বলেছেন। এমন কোনো মা-বাবা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে তার সন্তান সর্বোত্তম হোক এটা চায় না। তাই উত্তম হওয়ার যে মাপকাঠি তথা কুরআন শিক্ষা করা তা না করে তো কেউই উত্তম হতে পারবে না। কুরআন মাজীদ না শিখে দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান শিখে ফেললেও সেই ব্যক্তিকে সর্বোত্তম বলা যাবে না। তাই সর্বাগ্রে সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া জরুরি।

সন্তানকে যদি মা-বাবা কুরআন শিক্ষা দেন তাহলে আখিরাতে তারা অশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মুআয জুহানী রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়বে এবং এর উপর আমল করবে তার পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন এমন এক মুকুট পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলো হতেও উজ্জ্বল হবে; যদি সে সূর্য তোমাদের ঘরের ভিতর হয়। (তবে তা যে পরিমাণ আলো ছড়াবে সে মুকুটের আলো উহা হতেও অধিক হবে।) তাহলে সে ব্যক্তি সম্পর্কে কী ধারণা যে স্বয়ং কুরআনের উপর আমল করেছে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৪৮)

সন্তানকে সুসন্তান ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আরেক উত্তম পদ্ধতির নাম হল সৎসঙ্গ। এজন্য প্রথমেই সন্তানকে ভাল সংশ্রবে রাখা দরকার। কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাক বলেন, ''তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাক।'' এর রহস্য হল, সত্যবাদীদের সাথে থাকলে সত্যবাদী হওয়া যায়, আর মিথ্যাবাদীদের সাথে থাকলে মিথ্যাবাদী হওয়ার আশংকা রয়েছে। এটা কুরআন-হাদীস, বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারাই প্রমাণিত ও অতি বাস্তব কথা। দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে মেয়েদের সাথে কখনো নিজ সন্তানকে মিশতে দেয়া ঠিক নয়। সেজন্য সংশ্রবের ব্যপারে সতর্ক থাকা জরুরি। মন্দ সংশ্রবের কারণে বাচ্চাদের মধ্যে মন্দ স্বভাবের প্রভাব পড়ে।

বর্তমান যুগের মায়েরা আরেকটি কথা বলেন যে, ছেলে-মেয়েরা ঘরে থাকে না শুধু বাইরে চলে যায়, তাই টিভি কিনে দিয়েছি। জেনে রাখা উচিত, টিভি, ভিসিডি এগুলো চরিত্র ও ঈমান বিধ্বংসী হাতিয়ার। এসব জিনিস দিয়ে সন্তান ধ্বংস হওয়ার অসংখ্য ঘটনা চোখের সামনেই বিদ্যমান। সুতরাং আমাদের নিজেদেরই উপায় বের করতে হবে কীভাবে আমরা সন্তানদের এগুলো থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলি সন্তান আদর্শবান হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপায়। এ ছাড়া মা যদি সন্তানকে প্রকৃত আদর্শবান করে গড়ে তুলতে চান তাহলে তার উচিত ছোট থাকতেই সন্তানকে প্রতিটি কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতে অভ্যস্ত

করে তোলা। এর একটি উপায় হল, তার সামনে নিজে সুন্নতের আমল করা। জায়গায় জায়গায় মাসনূন দুআগুলি পাঠ করা। এতে নিজেরও উপকার হবে সন্তানেরও ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে।

এ কাজটি আমরা এভাবে করতে পারি:

* যখন বাচ্চা ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখন মা তার সামনে ঘুম থেকে উঠার দুআ পড়ে নিবেন। যদিও বাচ্চা পড়তে না পারে কিন্তু এ থেকেই তার মাঝে অভ্যাস গড়ে উঠবে।

* বাচ্চা বাথরুমে গেলে খেয়াল রাখা সে জুতা পায়ে দিল কি না। মাথায় টুপি বা রূমাল-ওড়না না থাকলে তা পরিয়ে দেয়া। বাথরুমে যাওয়া-আসার দুআ এবং অন্যান্য আদবগুলি মা জোরে জোরে বলে দিবেন তখন সে শুনতে শুনতেই মুখস্থ করে ফেলবে।

* পোশাকাদির ক্ষেত্রে ডান-পা ডান-হাত আগে পরিয়ে দেয়া। অনুরূপ জুতার ক্ষেত্রেও। নতুন কাপড় হলে তার দুআও শিখিয়ে দেয়া।

* বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময় বলা, এক জায়গায় বসে খেতে হয়, মাটিতে পড়ে গেলে উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেতে হয় এবং খাওয়ার অন্যান্য আদব যেমন বিসমিল্লাহ বলা, দুআ পড়া, দস্তরখান বিছানো এগুলো শেখানো।

* কাউকে কিছু দিতে হলে কিংবা নিতে হলে যেন ডান হাতে নেয় সেদিকে খেয়াল রাখা।
*ঘরোয়া তালীমের ব্যবস্থা জোরদার
*নামাযের খুব এহতেমাম
*তিন কালিমা, দুরূদ শরীফ, যিকির, তিলাওয়াত, তাসবীহ, এস্তেগফার- এগুলোর প্রতি যত্নশীল হওয়া

* বাচ্চাদের তরবিয়তের ব্যাপারে বিশেষভাবে খেয়াল রাখ। শরীয়ত অনুযায়ী তাদের প্রতিপালন কর। তাদেরকে সুন্নতের উপর রাখার ফিকির কর।
অনেক বাচ্চাদেরই অভ্যাস কাউকে কিছু দিতে চায় না। তাই কাউকে কিছু দিতে চাইলে বাচ্চার মাধ্যমেই দেয়ার চেষ্টা করা। মাঝেমধ্যে তার সঙ্গী-সাথী বাচ্চাদেরকেও কিছু দেয়ার অভ্যাস করানো। এতে করে তার মধ্যে অন্যকে দেয়ার গুণ সৃষ্টি হবে।

* বাসায় মেহমান আসলে নিজে যেমন সালাম দিবে, মুসাফাহা করবে তেমনি বাচ্চাকে দিয়েও করাবে।

* কোনো কাজ বাচ্চার মাধ্যমে করালে সাথে সাথে মাশাআল্লাহ বলবে। কোনো কিছু হারিয়ে গেলে ইন্নালিল্লাহ বলা শেখাবে। হোক সেটা অতি তুচ্ছ জিনিস। এমনিভাবে যেখানে যা বলতে হয় যেমন জাযাকাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ ইত্যাদি গুরুত্বের সাথে শেখানো। দুআগুলি যেন জায়গায় জায়গায় অটোমেটিক বলতে পারে এ চেষ্টা করা। এর দ্বারা বাচ্চার যিকিরের অভ্যাস হয়ে যাবে।

* ছবিযুক্ত পোশাক পরাবে না। ভুলেও পশ্চিম দিকে পেশাব করাবে না।

* কাউকে গালি দিলে কিংবা কোনো আঘাত করলে সাথে সাথে তার থেকে মাফ চাইয়ে নেয়া। যাতে সে অন্যায়টা বুঝতে পারে এবং মাফ চাওয়ার গুণ তৈরি হয়। কাজের মানুষের সাথে যেন খারাপ আচরণ না করে সেদিকেও খেয়াল রাখা।

* যথাসম্ভব নম্রতার দ্বারা আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া। নম্রতার দ্বারা যা হয় কঠোরতার দ্বারা তা হয় না। এজন্য কঠোরতা বাদ দিয়ে নম্রতার দ্বারাই শেখানো উচিত।

উপরোক্ত আদব কায়দাগুলি শেখানো মা-বাবা উভয়ের দায়িত্ব। ইতিহাসের পাতায় আমরা যত মহান ব্যক্তিদের দেখতে পাই তাদের এই সফলতার পিছনে দেখা যায় মায়ের অবদান বেশি। আর মা হলেন সন্তানের জন্যে প্রথম পাঠশালার প্রথম শিক্ষক। তাই মাকে হতে হবে সন্তানের প্রতিটি ক্ষেত্রে সজাগ ও দায়িত্ববান। ইসলামী কবি আল্লামা ইকবাল বলতেন যে, বিলেত থেকে ফেরত আসার পরও যখন আল্লাহকে ভুলিনি তখন আশা করা যায় আর ভুলবো না। যখন লোকেরা বলত, ইকবাল! বিলেতের ঐ চাকচিক্য দেখেও তুমি কী করে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে পারলে? উত্তরে বলতেন, সেই ছোটকালে আমার মা আমার চোখে যে মুহাম্মাদী

সুরমা-ইসলামী শিক্ষা লাগিয়ে দিয়েছেন তার বরকতে এত কিছু স্বত্ত্বেও আমি আল্লাহকে ভুলিনি।

শিশুর মনমানসিকতা, ধ্যান-ধারণা, বোধ-বিশ্বাস, রুচি-শিক্ষা, স্বভাব-সভ্যতা, ভদ্রতা তথা সদগুণ একজন মা যত সহজে তার সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেন অন্য কারো দ্বারা তা ততটা সহজে সম্ভব নয়।
আল্লাহ তাআলা প্রতিটি নারীকে সচেতন ও দায়িত্ববান মা হওয়ার তাওফীক দান করুন।

**কন্যা সন্তান লালনপালনের নববী আদর্শ ও তার ফযিলত**

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় দুলালী হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। নবীজীর চার মেয়ের মধ্যে বয়সে তিনি ছিলেন সবার ছোট। আবার মেয়েদের সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন। ব্যতিক্রম কেবলই হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তাই আদরের মেয়েদের প্রতি মনে কী পরিমাণ ভালোবাসা ও মমতা পুষতেন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার নমুনা আমরা সবচেয়ে বেশি লক্ষ করি হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে তাঁর আচরণে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনা-

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ حَدِيثًا وَكَلاَمًا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَاطِمَةَ، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا، فَرَحّبَ بِهَا وَقَبّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ ، فَرَحّبَتْ بِهِ وَقَبّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا.

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথাবার্তায় ফাতেমার চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকেই দেখিনি। সে যখন তাঁর কাছে আসত তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন, তাকে স্বাগত জানাতেন, চুমো খেতেন এবং নিজের আসনে তাকে বসাতেন। আবার যখন তিনি ফাতেমার কাছে যেতেন তখন সেও তাঁর জন্যে উঠে দাঁড়াত, তাঁর হাত ধরত, তাঁকে স্বাগত জানাত, চুমো খেত এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাত। -আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৯৭১

হযরত উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহা। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতনী। তিনি যখন শিশু, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাকে কাঁধে চড়িয়ে মসজিদে চলে এলেন। এরপর এভাবেই নামাযে দাঁড়ালেন। দাঁড়ানো থেকে যখন রুকুতে যাবেন তখন তাকে নামিয়ে নিলেন। এরপর দাঁড়িয়ে আবার তাকে কাঁধে চড়ালেন। এভাবেই তিনি পুরো নামায শেষ করলেন। -সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৭১১

শুধুই নিজের মেয়ে আর নাতনীদের নিয়ে নয়, এমন আদর আর ¯েœহের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে অন্য সাহাবীদের মেয়েদের ক্ষেত্রেও। একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু কাপড় এল। এর মধ্যে একটি ছোট কালো কাপড়ও ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবীদের লক্ষ করে বললেন, এই কাপড়টি আমরা কাকে পরাতে পারি–বল দেখি! সকলেই চুপ করে রইল।

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা উম্মে খালেদকে আমার কাছে নিয়ে আস। তাকে তখন কোলে করে নিয়ে আসা হল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই কাপড়টি হাতে নিয়ে তাকে পরিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, أَبْلِي وَأَخْلِقِي অর্থাৎ তুমি তা পরে পুরনো করে ফেলো! কাপড়টিতে কিছু বিশেষ চিহ্ন ছিল। সেগুলো দেখিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখো, কী চমৎকার! -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮২৩, ৫৮৪৫

হাদীসের কিতাবে, সীরাতের গ্রন্থাবলিতে এমন ঘটনা আরও অনেক বর্ণিত হয়েছে। মেয়েশিশুদের তিনি খুবই আদর করতেন। অবশ্য ছেলেরাও তাঁর এ অকৃত্রিম স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতো না। প্রিয় নাতিদ্বয় হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে নিয়ে তো কত ঘটনা ছড়িয়ে আছে! কতভাবে তাদের আদর করেছেন! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে ইবরাহীম রা. যখন দুগ্ধপোষ্য শিশু, ধাত্রীমায়ের কাছে থাকে, তখন ছেলেকে তিনি দেখতে যেতেন বলেও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ছেলের মৃত্যুতে তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রুও ঝরেছে। আসলে এসবই মানুষের স্বভাবজাত, অকৃত্রিম। নিজের ঔরসজাত ছেলেমেয়ের প্রতি, তাদের সন্তানাদি তথা নাতি-নাতনীর প্রতি মানুষমাত্রই অনুভব করে এক অকৃত্রিম টান, নিখাঁদ ভালোবাসা। এর কোনো তুলনা হয় না, এটা অমূল্য। মানবজীবনের এ স্বাভাবিক দিকটির ওপর পবিত্র কুরআনে এভাবে আলোকপাত করা হয়েছে-

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا .

মানুষের জন্যে সুশোভিত করা হয়েছে চিত্তাকর্ষক বস্তুর আকর্ষণ, যেমন নারী, সন্তানাদি, পুঞ্জীভূত রাশি রাশি স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু আর ক্ষেতখামার। এসব পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৪

সন্তানকে দেখে বাবা-মায়ের চোখ জুড়ায়। তার যে কোনো সফলতা কিছু সময়ের জন্যে হলেও বাবা-মায়ের কষ্টকে ভুলিয়ে দেয়। এর ব্যত্যয় যেন না ঘটে, পবিত্র কুরআনে তাই দুআ শিখিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করুন, যারা হবে আমাদের নয়নপ্রীতিকর; আর আমাদেরকে আপনি মুত্তাকিদের প্রধান করে দিন। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৭৪

নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে হলেও মানুষ সন্তানের জীবন রক্ষা করতে চায়। সন্তানের সুখময় ভবিষ্যতের চিন্তায় নিজের বর্তমানের সুখকেও ভুলে থাকতে চায়। সন্তানের প্রতি ভালবাসা এমনই। ছেলে-মেয়ে এখানে সমান। দুজনই সন্তান এবং বাবার হৃদয়ের ভালবাসা উভয়ে সমানভাবেই দখল করে নেয়। মেয়েশিশুদের মতো স্বাভাবিকভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেশিশুদেরও ভালবেসেছেন, আদর করেছেন, কোলে তুলে নিয়েছেন। তবে মানুষের স্বভাবজাত এ আকর্ষণের পাশাপাশি মেয়েশিশুদের লালনপালন, তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ, তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে বিকশিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যে ফযিলত বর্ণনা করেছেন, সেখানে মেয়েরা অনন্য। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের ভরণপোষণের জন্যে কোথাও বেহেশতের ওয়াদা করেছেন, কোথাও তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ কিংবা লালনপালনের জন্যে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। লক্ষ করুন-

مَنْ كُنّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِنّ، وَيَرْحَمُهُنّ، وَيَكْفُلُهُنّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ الْبَتّةَ "، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: " وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ "، قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ، أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً، لَقَالَ: " وَاحِدَةً".

যার তিনজন কন্যা সন্তান হবে আর সে তাদের আবাসের ব্যবস্থা করবে, তাদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করবে এবং তাদের ভার বহন করবে, তার জান্নাত নিশ্চিত। জিজ্ঞেস করা হল-ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি দুইজন হয়? বললেন, দুইজন হলেও। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবীগণের কারও কারও ধারণা-‘যদি কেউ বলত একজন হলে? তাহলে নবীজী বলতেন, একজন হলেও।’ -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৪২৪৭; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৩৪৬

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لاَ يَكُونُ لأَحَدِكُمْ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنّ إِلاّ دَخَلَ الجَنّةَ.

তোমাদের কারও যদি তিনটি মেয়ে কিংবা তিনজন বোন থাকে আর সে তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে, তাহলে সে জান্নাতে যাবে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১২

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنّ وَاتّقَى اللهَ فِيهِنّ فَلَهُ الجَنّةُ.

যার তিনটি মেয়ে কিংবা তিনজন বোন রয়েছে, অথবা দুইটি মেয়ে কিংবা দুইজন বোন রয়েছে আর তাদের সঙ্গে সে ভালো ব্যবহার করেছে এবং তাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করেছে তাহলে তার জন্যে রয়েছে জান্নাত! –জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৬

مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ البَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنّ كُنّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النّارِ.

মেয়েদের লালনপালনের দায়িত্ব যার কাঁধে অর্পিত হয় আর তাদের বিষয়ে সে ধৈর্যধারণ করে তাহলে তারা তার জন্যে জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল হয়ে থাকবে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৩

এই হল মেয়েশিশুকে লালনপালন করে তার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে তাকে সঠিক দীক্ষা দিয়ে বড় করে তোলার পুরস্কার-বেহেশতের নিআমত লাভ আর দোজখের আগুন থেকে মুক্তি! একজন পরকাল-বিশ্বাসী মুমিনের জন্যে এর চেয়ে বড় কোনো পুরস্কারের আর দরকার

হয় না। কিন্তু হাদীস শরীফে মেয়ের অভিভাবকের জন্যে ঘোষিত হয়েছে এর চেয়েও বড় এক পুরস্কার! পড়–ন-

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِأُصْبعَيْه.

যে দুটি মেয়েশিশুকে দেখাশোনা করল, লালনপালন করল, আমি এবং সে এভাবে জান্নাতে প্রবেশ করব। একথা বলে তিনি হাতের দুই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখিয়েছেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৪

পরকালে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভ করা-একজন নবীপ্রেমিক এর চেয়ে বেশি আর কী আশা করতে পারে! মেয়েরা তাই বাবা-মায়ের জান্নাত লাভের মাধ্যম, জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির মাধ্যম এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভের মাধ্যম। এরা পরকালীন মুক্তির পয়গাম। এ মর্যাদা ও ফযিলত এককভাবে মেয়েদেরই, ছেলেদের ভরণপোষণে এমন কোনো অঙ্গীকার নেই। হাঁ, সন্তান যদি নেককার হয়, তাহলে তো তার দুআর ফল মৃত্যুর পর কবরে থেকেও ভোগ করা যাবে, সে ছেলে বা মেয়ে যা-ই হোক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কালে যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এ ফযিলতের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তা মোটেও এর অনুকূল ছিল না। বাবারা মেয়েশিশুকে নিজের জন্যে খুবই অপমানের বিষয় মনে করত। একটা সময় এসে তারা নিজহাতে নিজের মেয়েদের জীবন্ত দাফন করতে শুরু করল। পবিত্র কুরআনের একটি বর্ণনা-

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ، يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ، اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ، اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

তাদের কাউকে যখন মেয়েশিশুর সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গøানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে-হীনতা সত্তে¡ও তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা কত নিকৃষ্ট! -সূরা নাহল (১৬) : ৫৮-৫৯

খোলা চোখে ছেলেসন্তানকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এদের মাধ্যমে বংশধারা টিকে থাকবে, এরা বুড়ো বয়সে পাশে থাকবে, দুনিয়ার জীবনে এরা হবে একটা আশ্রয় ইত্যাদি চিন্তা মানুষ করে থাকে। কিন্তু ভবিষ্যতে আসলেই যে কী হবে-তা তো একমাত্র আলিমুল গায়েব আল্লাহ তাআলাই জানেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মা হযরত মারইয়াম রা.।
মারইয়ামের জন্মের আগেই তার মা মান্নত করেছিলেন-সন্তান জন্মের পর তাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতে নিয়োজিত করবেন। তার ধারণা ছিল-তিনি ছেলেসন্তান জন্ম দেবেন। কিন্তু তিনি যখন এক মেয়েসন্তান প্রসব করলেন তখন কিছুটা হতাশার সুরে বলেছিলেন-হায়!

আমি তো এক মেয়ে জন্ম দিলাম! মেয়েরা মসজিদের খেদমতের জন্যে উপযুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলা তখন তাকে বলেছিলেন-

وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى.

ছেলে তো মেয়ের মতো নয়। [সূরা আলে ইমরান, ৩৬ নং আয়াত দ্রষ্টব্য]

অর্থাৎ যে ছেলে তুমি চেয়েছিলে, সে ছেলে মর্যাদায় তোমাকে যে মেয়ে দান করা হয়েছে তার সমস্তরে পৌঁছতে পারবে না। তাই আর ভাবনা কীসের! পরবর্তীতে কী হয়েছে তা তো আমাদের জানা-ই। এই মেয়েকে আল্লাহ তাঁর কুদরতের এক নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছেন। কোনো পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই তার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম!

মেয়েশিশুদেরকে নিয়ে সেকালের পাষণ্ডতার একটি উদ্ধৃতি দিই। এক সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিজের ঘটনা শুনিয়েছেন। তার ভাষ্য-আমার যখনই কোনো মেয়েশিশু জন্ম নিত আমি তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলতাম। একবার আমি সফরে ছিলাম। তখন আমার এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার মা তাকে বাড়িতে না রেখে তার মামাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আমি যখন সফর থেকে ফিরে আসি তখন সন্তানের খবর নিই। সে আমাকে বলল-আমাদের এক মৃত শিশু জন্ম নেয়। এভাবে অনেক দিন কেটে যায়। আমার মেয়েটি তার মামার বাড়িতেই বড় হতে থাকে। একদিন সে তার মাকে দেখতে আসে। তার সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হই। পরে আমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি-সে আমারই মেয়ে। এরপর আমি তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। তার জন্যে মাটিতে একটি গর্ত খুঁড়ি। তাকে সেখানে ফেলে দিই। সে আমার কাছে জানতে চায়-বাবা, তুমি আমাকে কী করবে? আমি তার উপর মাটি ফেলতে থাকি আর সে বলতে থাকে-বাবা, তুমি কি আমাকে মাটিচাপা দিচ্ছ? আমাকে একাকী ছেড়ে দাও, আমি অন্য কোথাও চলে যাই। কিন্তু তার কোনো কথা না শুনে আমি তার উপর মাটি ফেলতেই থাকি, একপর্যায়ে তার সব আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যায়। এ বিবরণ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, এ তো নির্ঘাত এক পাষণ্ডতা! যে দয়া করে না, তাকেও দয়া করা হবে না! (আলওয়াফী বিল ওয়াফায়াত, কায়েস ইবনে আসেম এর জীবনী দ্রষ্টব্য)

এই পরিস্থিতি যখন সমাজে বিরাজ করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েশিশুদের ভরণ-পোষণের এমন অতুলনীয় ফযিলতের কথা ঘোষণা করেছেন। এর পাশাপাশি সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছিল নারীদের বিভিন্ন অধিকারের কথাও। অথচ তখনকার সমাজে নারীদের কোনো অধিকার তো নয়ই, বরং তাদের মানুষ হিসেবেও স্বীকৃতি ছিল না।

প্রায় দেড় হাজার বছর আগের অন্ধকার পৃথিবীতে আলো জ্বালিয়েছিলেন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অথচ এই আধুনিক যুগেও আমরা সেই অন্ধকারেই যেন ঘুরপাক খাচ্ছি। খুব ব্যাপকাকারে না হলেও, সমাজের মানুষের চোখে মেয়েশিশু ততটা কাঙ্ক্ষিত নয়। যদি কোনো নারীর পরপর দুটি মেয়েসন্তান হয় কিংবা ছেলেসন্তান কারও না-

ই থাকে, অনেকের চোখে সে নিন্দার পাত্রে পরিণত হয়। মায়েরা ভয়ে থাকে-তাদেরকে কখন আবার কী শুনতে হয়! মেয়েশিশুর জন্মের সংবাদ কারও কারও জন্যে কোনো আনন্দই বয়ে আনে না, আবার কারও জন্যে তা হয়ে পড়ে কষ্টের বিষয়-ঠিক জাহেলি যুগের মতো! জীবন্ত পুঁতে ফেলার রেওয়াজ যদিও এখন নেই, কিন্তু মেয়েশিশুর প্রতি মানসিকতা যেন সেই অন্ধকার যুগের মতোই! তবে ব্যতিক্রমও আছে। আমাদের সমাজে যাদের কেবলই ছেলে, তাদের অনেককেই একটি মেয়েশিশুর জন্যে আক্ষেপ করতে দেখা যায়। মেয়েদের ছাড়া যেন সংসারের পূর্ণতা আসে না!

এ কথা তো অনস্বীকার্য-বাবা কিংবা মা, তাদের একজনের অনুপস্থিতিতে পরিবারে যেমন একধরনের শূন্যতা নেমে আসে, তেমনি ভাইকে ছাড়া বোন এবং বোনকে ছাড়া ভাইও একধরনের শূন্যতা অনুভব করে।

সন্তানাদি আমাদের পরিবারের প্রদীপ। এ প্রদীপ দুনিয়াতে জীবনকে আলোকিত করে রাখে। আবার পরকালের সফরেও এরা 'পাথেয়'। তবে কোনো পরিবারে সন্তান যদি ছেলেও থাকে, মেয়েও থাকে, কেমন যেন আমরা সে পরিবারকে একরকমের পূর্ণ পরিবার মনে করি। ছেলে-মেয়ে উভয় প্রকারের সন্তানের প্রতি আকর্ষণ তাই মানুষের এক স্বভাবজাত বিষয়। কিন্তু আমরা সকলেই এ বিশ্বাসও করি-সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে, এ নিয়ে বাবার কিংবা মায়ের কিছুই করার নেই। এটা সম্পূর্ণই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুসারে হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ বিষয়টিই স্পষ্ট করে দিয়েছেন :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তিনি কন্যাসন্তান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা দান করেন পুত্রসন্তান। অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তিনি বন্ধ্যা করে রাখেন। তিনি সর্বজ্ঞ, শক্তিমান। -সূরা শূরা (৪২) : ৪৯-৫০

একজন আল্লাহ-বিশ্বাসী মুমিন হিসেবে চিন্তা-চেতনায় এবং কাজে-কর্মে এ বাণীর প্রতি পূর্ণ আস্থা আমাদের রাখতেই হবে।

**সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সময় মায়েদের যে কষ্ট হয় তার ফজিলত**:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ سَلَامَةَ حَاضِنَةَ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُبَشِّرُ الرِّجَالَ بِكُلِّ خَيْرٍ وَلَا تُبَشِّرُ النِّسَاءَ؟ قَالَ: «أَصُحَيْبَاتُكِ دَسَّسْنَكِ لِهَذَا؟» قَالَتْ: أَجَلْ، هُنَّ أَمَرْنَنِي قَالَ: «أَفَمَا تَرْضَى إِحْدَاكُنَّ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا مِنْ زَوْجِهَا، وَهُوَ عَنْهَا رَاضٍ أَنَّ لَهَا مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِذَا أَصَابَهَا الطَّلْقُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ مَا أُخْفِيَ لَهَا مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا جُرْعَةٌ مِنْ لَبَنِهَا، وَلَمْ يَمُصَّ مَصَّةً إِلَّا كَانَ لَهَا بِكُلِّ جُرْعَةٍ وَبِكُلِّ مَصَّةٍ حَسَنَةٌ، فَإِنْ أَسْهَرَها لَيْلَةً كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ سَبْعِينَ رَقَبَةً تُعْتِقُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

হযরত আনাস বিন মালেক রাঃ থেকে বর্ণিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে ইবরহীমের পরিচর্যাকারী সালামা রাঃ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! শুধু পুরুষদের উত্তম উত্তম সুসংবাদ দেন নারীদের কেন সুসংবাদ দেন না?

নবীজী বললেন, তোমার সাথীরা এ কারণে তোমাকে পাঠিয়েছে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারাই আমাকে উৎসাহ দিয়েছে।

নবীজী ইরশাদ করলেন, তোমাদের কেউ কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যখন তোমাদের স্বামী তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় তোমরা স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভধারীনী হও, তখন তোমরা আল্লাহর পথে রোযাদারের সমান সওয়াবের ভাগী হও। আর যখন প্রসব বেদনা শুরু হয়, তখন আসমান ও জমিনের অধিবাসী কেউ জানে না, তার জন্য চক্ষু শীতলকারী কি পুরস্কার লুকায়িত থাকে। আর যখন প্রসব হয়ে যায়, তখন নবজাতকের দুধপানের প্রতিটি ঢোক এবং প্রতিটি চোষণের বিনিময়ে একটি করে নেকী লেখা হয়। আর যদি নবজাকতের কারণে জাগ্রত থাকতে হয়, তাহলে প্রতিটি রাতের বিনিময়ে সত্তরটি কৃতদাস আল্লাহর রাস্তায় আযাদের সওয়াব দেয়া হয়। [আলমু'জামুল আওসাত লিততাবরানী, হাদীস নং-৬৭৩৩]

عن ابن عمر- أحسَبُهُ قد رفَعَهُ- قال: «المَرْأَةُ في حَمْلِهَا إِلى وَضْعِهَا إِلى فِصَالِهَا، كَالْمُرَابِطِ في سَبِيلِ اللهِ، فَإِنْ مَاتَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيد»

ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। মহিলা গর্ভধারণ থেকে নিয়ে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারের ন্যায় সওয়াব পেতে থাকে। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে শহীদের সওয়াব পায়। [আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী, হাদীস নং-১৩৭৩৪]

এ হাদীসগুলো দুর্বল হলেও জাল নয়। আর ফযীলতের ক্ষেত্রে এমন হাদীস দলীলযোগ্য।

**নেককার সন্তান সন্ততি পরকালে বাবা-মার মুক্তির উপায়**

সুসন্তান বাবা-মার জন্য দুনিয়াত ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর। আর কুসন্তান বাবা-মার জন্য অভিশাপ। কারণ কুসন্তানের জন্য বাবা-মা দুনিয়াতে অপমানিত হওয়ার পাশাপাশি হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারে আসামি হিসেবে দাঁড়াতে হবে।

সুসন্তানকে ইসলামের পরিভাষায় নেককার সন্তান বলা হয়। নেককার সন্তান এই দুনিয়ার জন্য বরকতময় আবার পরকালেরও সঞ্চয়পত্র। মানুষ মৃত্যুর পর আমলের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু কিছু আমল দুনিয়ায় থাকাকালীন অবস্থায় করে যাওয়ার কারণে তার সাওয়ার মৃত্যুর পরও পেতে থাকে।

হজরত আবু হুরাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার আমলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি

আমল কখনো বন্ধ হয় না। এক, সদকায়ে জারিয়া, দুই, ওই ইলম যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়, তিন, নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। (সহিহ মুসলিম: ১৬৩১, সুনামে আবু দাউদ: ২৮৮০)

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন খুব কঠিন। মৃত্যুর পর যেখানে এই পৃথিবীর কোনো ধন-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য কাজে আসবে না। কেউ চাইলেই নিজের ভুলগুলো সংশোধন এবং আমল বাড়িয়ে হাশরের ময়দানে নাজাতের ব্যবস্থা করতে পারবে না। কিন্তু, মৃত্যুর পরও তিনটি পদ্ধাতি আমল জারি থাকে।

এই তিনটি আমলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নেককার সন্তান। মুসলমানের সন্তান-সন্তাতি যেন পরকালে যেন তাদের বাবা-মার মুক্তির কারণ হয় এই কামনা করছি।[1]

Assignment prepared by-
Meherun Nesha
Batch-201
Roll no.- 20102114
Islamic online Madrasah
Address- east Sheikhdi, al hera jame masjid road,Shonir akhra,Dhaka,
Phone-01999113809

[1]https://www.alkawsar.com/bn/topics/67/